KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : 28 বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-06 |
| Collection : KLMLGK | Publisher : আনন্দ চ্যাটার্জি (সমরজিৎ কর) |
| Title : সমকালীন : (SAMAKALIN) | Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৩২/-<br>৩২/-<br>৩৩/-<br>৩৪/- | Year of Publication : শ্রাবণ ১৩৯১ ॥ May 1984<br>কার্তিক ১৩৯১ ॥ Nov 1984<br>কার্তিক ১৩৯২ ॥ Nov 1985<br>কার্তিক ১৩৯৮ ॥ Nov 1991 |
| | Condition : Brittle : Good |
| Editor : আনন্দ চ্যাটার্জি (সমরজিৎ কর) | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

# সমকালীন

উনত্রিংশ বর্ষ ॥ কার্ত্তিক ১৩৯৮

Statement in from IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956

SAMAKALIN

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Place of its Publication | Calcutta. |
| 2. | Periodicity of its Publication | Quarterly, |
| 3. | Printe's Name | Anandagopal Sengupta |
| | Nationality | India. |
| | Address | 24, Chowringhee Road, Calcutta-87 |
| 4. | Publisher's Name | Anandagopal Sengopta. |
| | Nationality | Indian. |
| | Address | 24, Chowringee Road, Calcutta-87 |
| 5. | Name and address of individuals own the Newspaper and partner sharholders holding more than one per cent of the total capital | Anandagopal Sengupta. Proprietor. 24, Chowringee Road, Calcutta-700087. |

I, Anandagopal Sengupta, herebly declare that the particulars givin above are true to the best of my knowledge and belief (SD.) A. G. Sengupta

Dated, 1st March, 1991. Singature of Publisher



ঊনত্রিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

কার্তিক তেরশ আটানব্বই

## সূচীপত্র



**সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

29-2263

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

সমকালীন

বর্ষ ৩৯ কার্তিক ১৩৯৮

# সাক্ষরতা বনাম অশিক্ষা

**অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়**

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল সেদিন, যেদিন কেরলের এর্নাকুলম জেলা 'সম্পূর্ণ সাক্ষর' বলে ঘোষিত হয়েছিল। ভারতের প্রথম সাক্ষর জেলার সম্মান পেয়েছিল এর্নাকুলম। শিক্ষা প্রচারের দৌড়ে কেরল চিরকালই অবশিষ্ট ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে। এককালে ত্রিবাঙ্কুরের রানি যে কোষাগারের অর্থে রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা কেরলের ইতিহাসে বিরল ব্যতিক্রম নয়, বরং বেশ সুসমঞ্জস। বস্তুত, ওই এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ও নাকি অতীতে ক্রমাগত পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, কীভাবে জনস্বাস্থ্য এবং জনশিক্ষার প্রসারে অন্যদের চেয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। এক গবেষক তথ্যপ্রমাণ সহযোগে জানিয়েছেন, এভাবেই, জনকল্যাণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েই কেরলের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ নিজেদের আধুনিক করে তুলেছে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে অন্তত অংশত মুক্তি পেয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ নানা কর্মকাণ্ডই তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার একটা ধারা কেরলে দীর্ঘকাল প্রবাহিত ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালের রাজনৈতিক সচেতনতা ধারাকে বেগবান করেছে, আবার নিজেও সেই শিক্ষার পরিমণ্ডল থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই পরিমণ্ডলে সাক্ষরতা আন্দোলনের অগ্রগতি যে অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি ঘটবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। অতএব, উত্তর ভারতের রঙ্গভূমিতে যখন মন্দির নির্মাণের অবান্তর, সাম্প্রদায়িক ও অগ্নিগর্ভ আন্দোলন এবং রাজনীতি চলছে প্রবল বিক্রমে, কেরলে তখন দেখা গেছে অন্য সংগ্রাম—নিরক্ষরতা দূর করার সংগ্রাম। এর্নাকুলমে তার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছিল, এই ১৯৯১-এর এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ সমাপ্ত হল পরবর্তী অধ্যায়, কেরল ঘোষিত হল সম্পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে।

সম্পূর্ণ সাক্ষরতার এই শিরোপা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা নিয়ে সংশয় আছে, থাকবে। কেরলের

দীর্ঘ ঐতিহ্য সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে, যে রাজ্যে সকলেই কি আজ সাক্ষর? সাক্ষরতা আন্দোলনের আড়ম্বরের মধ্যে কতটা খাদ মিশে আছে, তার কোনও নির্ভরযোগ্য হিসেব কি হয়েছে? হওয়া কি সম্ভব এই দেশে? কেরল থেকে যদি ঘরের কাছে আমি, এই পশ্চিমবঙ্গে দেখি, তা হলে দেখব, ওই সংখ্যা শতগুণ বেড়ে গেছে। এ রাজ্যেও গত নির্বাচনের আগে কিছুদিন শোনা গিয়েছিল নিরক্ষতা দূরীকরণের স্লোগান। মেদিনীপুর, বর্ধমান, এমনকি এই কলকাতা শহরেও। তিনশো বছরের মহানগরকে এক বছরের মধ্যে নিরক্ষতামুক্ত করার শপথ নিয়েছিলেন রাজ্যের এবং শহরের অভিভাবকরা। কলকাতা পুরসভা শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে পারেন না, তাঁরাও স্লোগানে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছিলেন, নিরক্ষরতা থেকে কলকাতাকে তাঁরাও মুক্ত করবেন। নির্বাচনের দিন যত এগিয়েছে, এই প্রচারের প্রাবল্যও তত বেড়েছে, ভোটের ব্যানার আর সাক্ষরতা প্রসারের ব্যানার মিলে মিলে এক হয়ে গেছে। তারপর ভোট শেষ, এখন প্রচারও স্তব্ধ। ক'জন সাক্ষর হল, তার হিসেব কে দেবে? আর, হিসেবের দামই বা কতটুকু? পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের হালচাল নিয়ে অনেক কাহিনী। কোথাও কোথাও নাকি স্কুলের ছেলেমেয়েরা সাজগোজ করে বয়স্ক 'সাক্ষর'দের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসে, তারা পাশ করে, সাক্ষর (বয়স্ক) নাগরিকের সংখ্যা বাড়ে, কমে সরকারি খাতায় নিরক্ষরের অনুপাত। সংখ্যা তার অনুপাতের হিসেবই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়, তা হলে এরকমটা ঘটাই তো স্বাভাবিক, সংখ্যার অন্তরালে যে জীবন্ত মানুষগুলি, তাদের কথা ভাবার দরকার কী? ভাবার দরকার কী, যে শিক্ষা বিতরণ করা হচ্ছে, তার মান আদৌ সন্তোষজনক কি না।

সাক্ষরতা কর্মসূচির কোথায় কতটা ফাঁক আছে, তার কোনও ক্ষতিয়ান দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়, সে কাজ করতে পারেন তাঁরা, যাঁরা গ্রামে ও শহরে ঘুরে গবেষণা করছেন, তথ্য সংগ্রহ করে লেখালিখি করছেন পত্রপত্রিকায়। সরকারি হিসেবের প্রকাণ্ড ঘাটতি ও প্রচুর অসত্য যাতে আমাদের একমাত্র সম্বল হয়ে না দাঁড়ায়, সে জন্য এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজন অসীম। কিন্তু নিরক্ষরতা দূর করার এই কর্মকাণ্ড এবং আড়ম্বরের মধ্যে একটা মৌলিক প্রশ্ন হারিয়ে যাচ্ছে। সেটা অশিক্ষার প্রশ্ন। কলকাতার কথাই ভাবা যাক। ধরে নিলাম, আজ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কলকাতা শহর থেকে নিরক্ষরতা বিতাড়িত হল। শুধু অ আ ক খ নয়, দৈনন্দিন প্রয়োজনে যতটুকু শিক্ষা অপরিহার্য, সেটা পেয়ে গেল সমস্ত নাগরিক। যাকে আজকালকার পরিভাষায় বলা হচ্ছে 'ফাংশনাল লিটারেসি।' কিন্তু তার পরেও যে অতলান্ত অশিক্ষা আর কুশিক্ষা মহানগরে রয়ে যাবে, যার প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে চলবে গলি থেকে রাজপথ সর্বত্র, তার কী প্রতিকার? প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। সাক্ষরতা যে শিক্ষাবিস্তারের এক আবশ্যিক সোপান এবং অঙ্গ, সে বিষয়ে এই লেখকের তিলমাত্র সংশয় নেই। 'নিরক্ষর অথচ প্রাজ্ঞ' সনাতন ভারতবাসীর গৌরবে যাঁরা গৌরবান্বিত, তাঁদের গৌরব শুধু মিথ্যা এবং অবান্তর নয়, সমাজ ও দেশের অগ্রগতির পক্ষে, আধুনিকতার প্রসারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষর, সরল এবং 'ঐতিহ্যপরম্পরায় প্রাজ্ঞ' কৃষক হাজার বছরেও সবুজ বিপ্লব ঘটাতে পারেনি, (দেশের কয়েকটি অঞ্চলে) সে বিপ্লব সম্ভব হয়েছে এক দশকের মধ্যে, এবং সে জন্য সাহায্য নিতে হয়েছে পশ্চিমী প্রযুক্তি ও জ্ঞানের। আর্যাবর্তের গ্রামে প্রজ্ঞার বীজ প্রোথিত থাকলে, ভারতবর্ষের নিরক্ষর আমজনতা যথার্থ জ্ঞানী—এমনকি কাণ্ডজ্ঞানী হলে আজ মন্দির



নির্মাণের মতো অবান্তর বিষয় নিয়ে এই মাতামাতি দেখতে হত না। ঐতিহ্য এবং সহজাত প্রজ্ঞা নিয়ে কথা অনেক শোনা যায়, ইদানিং কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের নীতিপ্রস্তাবেও এ সব প্রাচীন কথা একটু বেশি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোনও অশিক্ষিত প্রজ্ঞা নয়, একমাত্র আধুনিক শিক্ষাই এই প্রাচীন দেশকে যথার্থ মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আর, সেই শিক্ষার এক অপরিহার্য ভিত নিশ্চয়ই সাক্ষরতা। এ জন্য কোনও বাম্মীয় তাত্ত্বিক আলোচনার কোনও দরকার নেই, অসংখ্য গবেষক অসংখ্য গবেষণায় দেখিয়েছেন, নিরক্ষরতা দূর হলে তার ফলে কীভাবে সমাজের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি আসে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ফলে—ন্যূনতম শিক্ষাটুকু মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেলেই—জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিশুর পরিচর্যা, মায়ের স্বাস্থ্য, সমস্ত বিষয়ই কত দ্রুত উন্নতি আসে তার প্রমাণ রয়েছে ঘরের কাছেই, শ্রীলঙ্কায়, কেরলে। যে গ্রামবাসীরা আগে বাবুদের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে পারতেন না অক্ষরজ্ঞানের সুযোগ পেয়ে তাঁরা কীভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, গ্রামের মোড়ল, থানার দারোগা, বি ডি ও, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিজেদের অভাব অভিযোগ নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে তর্ক করতে পারেন, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছি। সাক্ষরতার প্রয়োজনকে ছোট করে দেখেন বা দেখাতে চান একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা মনে মনে সাক্ষরতার প্রসারকে ভয় পান, যাদের চিরকাল পায়ের নীচে রেখে এসেছেন, পাছে তারা মর্যাদা দাবি করে—সেই ভয়।

কিন্তু প্রশ্ন সাক্ষরতার প্রয়োজন নিয়ে নয়, প্রশ্ন সাক্ষরতার ভূমিকা নিয়ে। সাক্ষরতা যদি তা সম্পূর্ণ ও ত্রুটীহীন হয়, তা হলেও শিক্ষার প্রথম সোপান মাত্র। যেহেতু একটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার চেয়ে তাকে সাক্ষর করা তুলনায় সহজ, সুতরাং সাক্ষরতা দিয়ে শিক্ষার কাজ চালিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা আমাদের সমাজপতি ও রাজনৈতিক মোড়লদের কথায় এবং আচরণে লক্ষ করা যায়। তাঁদের কাছে নিরক্ষরতার অনুপাতটাই হয়ে ওঠে অশিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি, সে অনুপাত কমলেই শিক্ষাবিস্তারের গৌরবে তাঁরা গৌরবান্বিত বোধ করেন। তাতে ক্ষতি ছিল না, যদি পাশাপাশি শিক্ষাপ্রসারের প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে চালু থাকত, যদি সেই প্রক্রিয়ায় ক্রমশই বেশি অনুপাতে মানুষ অংশ নিতে পারতেন। বস্তুত, একটি সভ্য, আধুনিক উন্নতিশীল দেশে তেমনটাই হওয়ার কথা। একদিকে সামগ্রিক শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে তৃণমূলে নিরক্ষরতা উচ্ছেদের সংগ্রাম, এই দুই ক্রিয়ার যৌথ পরিণামেই সম্ভব অশিক্ষার বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলন। দ্বিতীয়টি যদি ঘটেও —বা, প্রথমটি কি ঘটছে? সামগ্রিকভাবে কি আমাদের সমাজে শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে? তা যদি না হয়, তবে কিন্তু সাক্ষরতার সফল মিলবে না, এমনকি সাক্ষরতা আন্দোলনও ক্রমে বিপর্যস্ত হবে।

মূল সমস্যা সেটাই। সাক্ষরতা বা প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা, আর একটু বড়জোর ভাবলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সার্থকতা শুধু এই বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সামগ্রিক পরিমণ্ডলের ওপর, সেই পরিমণ্ডল আমাদের শিক্ষিত করার দিকে কতটা অগ্রসর হতে সাহায্য করছে তার ওপর। আর খুব গভীর উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়েছে সেখানেই। যে সমাজ, যে পরিমণ্ডল আমাদের চারপাশে, তা শিক্ষার সহায়ক নয়, তা অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার প্রেরণা দেয়, নানাভাবে যথার্থ শিক্ষার প্রসারকে তা অসম্ভব করে তোলে। এই পরিবেশে সাক্ষরতা আন্দোলনেও স্বভাবতই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে সামাজিক সংগ্রামে তার উত্তরণ ঘটে না।

সমাজের চরিত্র এবং সামাজিক আন্দোলনের সার্থকতা, এই দুইয়ের মধ্যে একটা জঙ্গম, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে সব সময়েই। প্রকৃত আন্দোলন যেমন সামাজিক কাঠামোকে বদলায়, পরিমার্জিত করে, আন্দোলনের প্রাণশক্তিও তেমনই সঞ্চারিত হয় এই কাঠামো থেকেই। সমস্ত বিষয়ে সেই সমাজ আমাদের পিছনে টানবে, আর ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কিছু শৌখিন কর্মসূচির জোরে আমরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলব, তা হয় না। এই মুহূর্তে সামাজিক প্রবণতা সর্ব অর্থে ই অশিক্ষার দিকে। সেই অসুস্থ প্রবণতাকে অতিক্রম করতে না পারলে কোনও সাক্ষরতা আন্দোলনই সফল হতে পারবে না।

এই অশিক্ষার নানা দিক আছে, নানা হেতুও আছে। তার কয়েকটির কথা আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি। প্রথমত, যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর সন্তান আজ শিক্ষিত হচ্ছে, তার সঙ্গে সমাজের সংযোগ সামান্য, সেই শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে তিলমাত্র সাহায্য করে না, তার লক্ষ্য নিতান্ত ব্যক্তিগত সাফল্য, আর সে সাফল্যও পরীক্ষার খাতায় মাত্র। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি সাম্প্রতিক স্লোগানের কথা। একে উস্কোগ বা কর্মসূচি না বলে স্লোগান বলাই ভাল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর দেশের স্কুলকলেজের ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন ছুটির অবসরে নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করানোর কাজে নামতে। সেই সুরে সুর মিলিয়ে রাজ্যে রাজ্যে স্কুলের ছাত্রদের 'সিলেবাস' সংস্কারের কথা উঠেছিল, যাতে প্রত্যেক স্কুল-পড়ুয়াকে কয়েকজন, অন্তত একজন বয়স্ক নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। এখানে ওখানে এই উস্কোগের কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, এই কলকাতা শহরের বেশ কয়েকটি স্কুলের ছেলেমেয়ে নাকি মহা উৎসাহে বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালানোর কাজে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সেটা নিজস্ব উৎসাহে, বা আবেগদীপ্ত প্রেরণায়, পরীক্ষার নম্বর পাওয়ার তাগিদে নয়। সিলেবাস বদলে বা পরীক্ষায় নম্বরের লোভ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে টেনে আনা যাবে বলে যাঁদের ধারণা, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। হাতের কাজ শেখানোর জন্য একসময় শুরু হয়েছিল 'ওয়ার্ক এডুকেশন'। তার ফলে পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয়েছে দোকান, যারা ছাত্রছাত্রীদের বায়না মাফিক হাতের কাজ সরবরাহ করে আর তারা সেই কাজ জমা দিয়ে নম্বর পায়। সাক্ষরতা প্রসারের জন্যও প্রয়োজনে এমন মেড-টু-অর্ডার ব্যবস্থা তৈরি হতে দেরি হবে না নিশ্চয়ই। আসলে আমাদের মতো দেশে সফল জনশিক্ষা আন্দোলনের একমাত্র সার্থক প্রেরণা হতে পারে সামাজিক দায়বোধ, যে দায়বোধের তাগিদে এবং সকলের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে কখনও কখনও শহরের সুখী সন্তানরাও পথবাসী কিংবা বস্তির মানুষকে লেখাপড়া শেখাতে বসে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, মুখে মনমুখী কার্যক্রম নিয়ে বড় বড় কথা অনেক বললেও কাজে তার আয়োজন দেখি অকিঞ্চিৎকর, যথার্থ সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার কোনও চেষ্টাই দেখি না। শ্রদ্ধেয় সমাজতত্ত্ববিদ ও প্রাক্তন সিভিলিয়ান অশোক মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেছিলেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে আলোকমালায় সাজিয়ে শুধু কলকাতার বাবুদের শৌখীন এবং প্রাণহীন দ্রষ্টব্য করে না রেখে ওই বিশাল আলোকিত চত্বরে সন্ধ্যাবেলায় শহরের বঞ্চিত শিশুদের জন্য বারোয়ারি পড়াশোনা আর খেলাধূলার আয়োজন হোক, আশুক সেখানে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী, নিষ্প্রাণ আলো পরিণত হোক জানাঞ্জনশলাকায়। যে প্রস্তাব, বলা বাহুল্য, কারও কানে



ঢোকেনি, জনপ্রেমী সরকার বাহাদুরেরও নয়। না কি, এই প্রস্তাব শুনে কলকাতার প্রতাপশালী 'এলিট' মনে মনে শিউরে উঠেছেন?

আসলে এলিটের কাছে সাক্ষরতা আন্দোলন বা জনশিক্ষা প্রসারের কোনও দাম নেই, কোনও অর্থ নেই। এলিট তার নিজস্ব শিক্ষা আর কেরিয়ার নিয়েই অতিব্যস্ত। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায়, স্কুল-কলেজে তার মৌরসী পাট্টা তো আছেই, কিন্তু তার বাইরে যে সামাজিক পরিবর্তন, সেখানেও সমস্ত সুরুচি এবং সুশিক্ষার সুফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। দূরদর্শনে ঝকঝকে বিদেশি তথ্যচিত্রের রস এরাই উপভোগ করতে পারে, আপামর মানুষের জন্য যে সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, সেগুলি ছেলে-মানুষিরও অধম। অ্যাকাডেমিতে ছবির প্রদর্শনী কিংবা গ্রুপ থিয়েটারের নাটক, দক্ষিণ কলকাতায় পুতুলের আসর, শীতকালে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বিদেশি বুদ্ধিনির্ভর চলচ্চিত্রের উৎসব—সব আয়োজনই উচ্চবিত্ত বড়জোর কিছু মধ্যবিত্তের জন্য। উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত সভ্যতার বাণী তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার কোনও তাগিদ কারও নেই। এলিটের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এলিটের নিজস্ব। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ তার প্রসাদ লাভ করে, বস্তুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সরবরাহ করে এই নাগরিক, সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। কিন্তু সেই মধ্যবিত্ত 'সাধারণ' নাগরিকও আমজনতা থেকে অনেক দূরে, দারিদ্র্য-সীমার অনেক ওপরে তার বাস। তার শিক্ষা, তার সংস্কৃতির প্রসার ঘটলে নীচের সারির অগণিত মানুষের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। আর, ওই নীচের সারির শিক্ষা এবং অশিক্ষা নিয়ে ধ্যাবিত্তেরও আসলে কোনও মাথাব্যথা নেই।

এই অবধি এক ধরনের সমস্যার কথা। যে সমস্যা এই যে, শিক্ষার প্রসার যারা ঘটাতে পারে, যে শ্রেণী বা গোষ্ঠী নিজেরা শিক্ষার আলো পেয়েছে, যে শ্রেণী থেকে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়তে পারত, সেই উপরতলা ও মাঝের তলার মানুষ একতলার বাসিন্দাদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি, ফলে জনশিক্ষা নিম্নমুখী হয়নি। কিন্তু এখানে সমস্যার শেষ নয়, তার শুরু। কারণ জনশিক্ষার এই ব্যর্থতার পাশাপাশি ঘটেছে এক সর্বব্যাপী শিক্ষার প্রসার। কুরুচি, নির্বোধ, উল্লাস, যুক্তিহীন ভাবনার অভ্যাস সবই ছড়িয়ে গেছে সমাজের সর্বস্তরে। চোখের সামনে ছড়ানো রয়েছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, অগণিত সঙ্কেত। চোখে যা সবচেয়ে বেশি পড়ে, তা অবশ্যই তথাকথিত 'গণমাধ্যম'। জনগণের রাজপথের ধারে কিংবা মফস্বলের রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অজস্র পত্র-পত্রিকা চোখে পড়ে তার আপাদমস্তক বিস্তৃত রয়েছে অবিশ্বাস্য অশিক্ষা আর রুচিহীনতা। তৈরি হয়েছে এক নরম পাঠকশ্রেণী, যারা এই সব জঞ্জাল থেকেই সংগ্রহ করে আপন মনের খোরাক—এই মনগুলোর কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয় মনে মনে। ঠিক যেমন আতঙ্কিত হই প্রায়শই সিনেমা হলের সামনে যুদ্ধ দর্শনের জনবিস্ফোরণ দেখে। তথাকথিত শ্লীলতার প্রশ্নই অবান্তর। অবান্তর 'আর্ট ফিল্ম' বনাম বাণিজ্যিক ছবির অসার, বস্তাবচা তর্ক। এটা আজ দিনের আলোর মতো সত্য যে অসংখ্য জঘন্য চলচ্চিত্রই আমাদের দর্শকের মন জয় করছে। দুধের বদলে পিটুলিগোলা নয়, দুধের বদলে বিষ পান করছে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক, সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতা। এই অসম্ভবের রাজত্বে সাধারণ এবং স্বাভাবিক যুক্তিবোধটুকুও যদি হারিয়ে যায়, আশ্চর্য কি? সেই সুযোগে, এবং সমাজে সসম্মানে জীবনধারণের সঙ্কট ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তাবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার ফলে অবিশ্বাস্য

দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে রকমারি দেবতা ও নানাপ্রকার গুরুদেবের প্রতাপ। খাস কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে, সরকারী রাজপথের ওপর দিনের পর দিন সুদৃশ্য সুসজ্জিত গাড়ি থেকে প্রচারিত হচ্ছে ভক্তির যে টইটম্বুর সঙ্কীর্তন—'ধর্মতলা' নামটি এতদিনে সার্থক হল বোধহয়! পাড়ায় পাড়ায় শনিমন্দিরের ছয়লাপ। যত্রতত্র যখন তখন ম্যারাপ বেঁধে বারোয়ারি পুজো—আরাধ্যের তালিকায় শেতলা, মনসা, রক্ষাকালী কেউ বাকি নেই। এ পথে সে পথে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝেই শুনি, বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ভজনের ধ্বনি, সুর প্রায় সাপুড়ের বাঁশির মতো, কল্পনা করতে পারি সহজেই—ওই কীর্তনের তালে তালে কয়েকটি মাথা দুলেই চলেছে, সাপুড়ের সাপেরই মতো। এই মাথাগুলিকেই রোজ বাসে যাওয়া-আসার পথে দেখতে পাই বিভিন্ন মন্দিরের এবং অনেক সময় অন্তরালবর্তী মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করতে। ধর্মপ্রাণ মানুষ এতে নিশ্চয়ই পুলকিত হবে। কিন্তু কোনও মহৎ ধর্মচিন্তার সঙ্গে এই সব সঙ্কীর্তন, ঢাকঢোল, প্রণামী, করজোড় প্রণিপাতের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ইটপুজোর মতোই নানা আঙ্গিকের ধর্মীয় আচারের মধ্যে আসলে রয়েছে সর্বব্যাপী অশিক্ষার প্রমাণ। এবং একটি অজটিতে ইন্ধন যোগায়। অশিক্ষিত মন অতি সহজে মেনে নেয়—বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু। আবার এই বিশ্বাসনির্ভরতাই যুক্তি আর শিক্ষাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, ডিগ্রোমাই যখন পারে না মজ্জাগত যুক্তিহীনতাকে দূর করতে, বহু 'শিক্ষিত' ব্যক্তি, এমনকি বিজ্ঞানীকেও যখন দেখি হাতে নানাবিধ গ্রহরত্ন পরে হরেক রকমের 'বাবা'র পায়ে সর্বাঙ্গে শুয়ে পড়তে, তখন ভেবে আতঙ্কিত হতে হয়—অসংখ্য মানুষের মনে শুধু এই অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারই পৌঁছয়, পৌঁছয় না শিক্ষা, যুক্তি যথার্থ জ্ঞানের কোনও আলোকরশ্মি।

এই ভয়াবহ অশিক্ষা আর কুসংস্কারকে মানুষের মন থেকে নির্মূল করতে না পারলে কোনও শিক্ষা আন্দোলনেরই কোনও সার্থকতা নেই। অনেকে বলেন, দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি না ঘটলে মানুষের আর্থিক অবস্থার প্রচুর উন্নতি না হলে শিক্ষার প্রসার ঘটে না, ঘটতে পারে না। এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই যে, ব্যাপক আর্থিক উন্নতি শিক্ষাবিস্তারের পথে অত্যন্ত সহায়ক, ঠিক যেমন সহায়ক অন্য নানা সামাজিক উন্নতির পক্ষেও। কিন্তু কবে আমার দেশের জাতীয় আয় বছরে দশ শতাংশ হারে বাড়বে, সেই ভরসায় হাত গুটিয়ে বসে থাকলে নিরক্ষরতা এবং অশিক্ষা দূর হবে না, আর অশিক্ষার এই জগদ্দল পাথর ঠেলে ব্যাপক অর্থ নৈতিক উন্নতিও সম্ভব হবে না।

মুশকিল এই, আমরা হুজুগে বিশ্বাস করি, কাজে নয়। বাঙালী চরিত্রের এই প্রাচীন বৈশিষ্ট্যটি এখন এ রাজ্যের সরকারী কর্তাদেরও মজ্জায় মজ্জায় ধরে গেছে। তিনশ বছর পুর্তির শৌখিন আড়ম্বরই তাঁদের পছন্দ, আর এই বর্ষপূর্তির হুজুগেরই অংশ হয়ে দাঁড়ায় 'সরকারি' সাক্ষরতা আন্দোলন। কাগজে কলমে একের পর এক জেলা সাক্ষর হবে, অথচ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীর থেকে গভীরতর হবে অশিক্ষার দৌরাত্ম্য। এই বোধহয় আমাদের নিয়তি।

# পড়ুয়ার সঙ্কট

## চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর সম্মান ও প্রতিপত্তির কারণ তার অর্থ ও সম্পদ নয় প্রধান কারণ ছিল তার বিদ্যাবত্তা। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজের অফিস-কাছারি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। প্রশাসনিক কাজে সঙ্গে গিয়েছিল ইংরেজী জানা বাঙালী কর্মীর দল, যারা কাশ্মীর থেকে আসাম এবং হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। বাঙালী এই বিদ্যা বিতরণের ভোজে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এবং অবাঙালীরা তা সানন্দে গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিল। সেদিন তারা স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি যে তাদের অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে বাঙালীর এক বড় ভূমিকা আছে। বিদ্যাচর্চার প্রতি এই আকর্ষণ বাঙালী পেয়েছিল তাঁদের জন্মভূমিতেই। তারা যে এখানে শুধু ইংরেজী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল তাই নয় বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে তার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে।

এইসব গ্রন্থাগারের অন্যতম ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৫ সালে। গ্রন্থাগারের পরিচালকবর্গ ও পাঠকদের মধ্যে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়—এই উভয় সম্প্রদায়ই ছিলেন। তাঁরা সমান উৎসাহে গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলেছিলেন। অনেক বিদেশী পরিদর্শক বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে এমন সুপরিচালিত গ্রন্থাগার য়ুরোপেও ছিল কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত সেকালের বিখ্যাত বাঙালী লেখক প্যারিচাঁদ মিত্র। তাঁর জ্ঞানচর্চা নানা ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছিল। প্যারিচাঁদ যখন গ্রন্থাগারিক হবার সুযোগ লাভ করেন তখন তাঁর উদ্যোগে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ভবনে ( মেটকাফ হল ) Bengal Social Science Association স্থাপিত হয়। এই সমিতির মুদ্রিত কার্য বিবরণী থেকে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র, পাদ্রি লঙ্ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট মনীষী সমিতির সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেছেন। মেটকাফ হলের গ্রন্থাগারিকের কক্ষটি তখন কলকাতার সংস্কৃতি চর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

প্যারিচাঁদ মিত্রের কিছুকাল পরেই বিখ্যাত বাগ্মী ও সুপণ্ডিত বিপিন চন্দ্র পাল গ্রন্থাগারিক হলেন। তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির একটি সুন্দর পুস্তক তালিকা সংকলন করেছিলেন এবং পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতেন। তাঁর স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের বেশ কিছুটা উন্নতি করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রায় ৬৫ বছর কার্যকালে বাঙালী পাঠক নানাভাবে গ্রন্থাগারিকদের নিকট থেকে উৎসাহ ও সমর্থন লাভ করেছে। পাঠ-রুচির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। পাঠকরা যেন শুধু গল্প-উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে জ্ঞানগর্ভ বই পড়তে উৎসাহ বোধ করে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সর্বদা তৎপর ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বই তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন পাঠকদের আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহান্বিত করবার উদ্দেশ্যে। প্যারিচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেছিলেন

বিদেশের বিষদ্‌জ্জন সভার কার্য বিবরণী সংগ্রহ করা কর্তব্য। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সঙ্কলন করবার প্রচেষ্টাও প্রথম থেকেই দেখা যায়। 'হিকির গেজেট' এবং অন্যান্য বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির-সংগ্রহ থেকে পেয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ সমৃদ্ধ হয়েছে।

বিপিনচন্দ্র পালের দেড় বৎসর গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করবার সময় সরকারী ও মিউনিসিপ্যালিটির অনুদানে গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা কিছুদিনের জন্যে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। নতুন বই কেনার সংখ্যা বাড়ল, পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল,—সবদিক থেকেই দেখা দিল আশার আলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল এই আশা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। যেসব য়ুরোপিয়ান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা ১৮৫৭ সালের পর থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকেন এবং একে একে গড়ে তুলতে থাকেন ক্লাব লাইব্রেরি নিজেদের প্রয়োজনে। প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপিয়ান ও ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে একটু একটু করে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এরফলে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

ধীরে ধীরে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি বন্ধ হবার মুখে এগোতে লাগল। লর্ড কার্জন শুনতে পেলেন এই লাইব্রেরির অবস্থা, এর গ্রন্থ সম্পদের কথা। একদিন নিজেই চলে এলেন গ্রন্থাগার দেখতে। দেখলেন অমূল্য সব বই, স্তূপের মধ্যে পড়ে ধুলায় এবং কীটদষ্ট হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রন্থ সম্পদ রক্ষা করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য বলে লর্ড কার্জন স্থির করলেন। সরকারের পরিচালনাধীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগার আগেই ছিল। কিন্তু তার ব্যবহার ছিল সীমিত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থ-সংগ্রহ কিনে ইম্পিরিয়াল লাইবেরির সঙ্গে যোগ করে দিয়ে তার ব্যবহারকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করলেন। লর্ড কার্জনের অভিমত ছিল এই গ্রন্থাগারে থাকবে যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের অবাধ নিঃশুল্ক প্রবেশাধিকার। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কোনো পরিচালক চেয়েছেন শুধু ডক্টরেট উপাধিধারীরাই জাতীয় গ্রন্থাগারে গবেষণার অধিকার লাভ করবেন, সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার এখানে থাকবে না।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তার মর্মার্থ এই : "প্রত্যেক সভ্য দেশে পাবলিক স্কুল পলিটেকনিক মিউজিয়াম ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। ভারত সরকার এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন দেখে আমরা আনন্দিত। অনেক দেশে বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—রাজ্য সরকার অথবা মিউনিসিপ্যালিটি শুধু যে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়বার সুযোগ দেয় তাই নয়; অবসর সময়ে পড়বার জন্য নাগরিকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বই বাড়িতেও নিতে দেওয়া হয়। এরজন্য চাঁদা দিতে হয় না। বোম্বাই শহরে যদি এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে তাহলে কলকাতায় তার প্রয়োজন আরো বেশী। সেখানে এমন অনেক লোক আছে যারা অবসর ভোগ করে; এমন নরনারী আছে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চাই যাদের জীবিকার্জনের পথ। তাদের পক্ষে লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের তেমন সুযোগ



নেই। জীবিকার্জনের জন্য তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কাজের ফাঁকে হয়তো আধঘণ্টা পড়বার সুযোগ হতে পারে। সুতরাং বই বাড়ি এনে পড়বার সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। আমি জানি কলকাতা লণ্ডন নয় এবং মেটকাফ হলের লাইব্রেরিকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তথাপি একথা বলা চলে যে, এই গ্রন্থাগারকে কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সহায় এবং যথার্থ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উৎসুক হন তাহলে সকাল দু'টা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পাঠকদের বই পড়বার সুযোগ দিতে হবে এবং বিনা চাঁদায় বাড়িতে বই নেবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।"

অবশ্য বিপিনচন্দ্র একথার উল্লেখ করেন নি যে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ভারতে সর্বপ্রথম নিঃশুল্ক পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে এরূপ একটি নিঃশুল্ক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য যে অর্থের দরকার হবে তা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি টাকা প্রতি এক পাই কর ধার্য করতে পারে। বলা বাহুল্য সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নি। কিন্তু ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির পক্ষে যতটা সম্ভব পাঠক সাধারণের সেবা করে গেছেন। শুধু কলকাতা শহরের পাঠকদেরই চাহিদা কর্তৃপক্ষ মেটান নি, তাঁরা ডাকযোগে মফস্বলেও বই পাঠাতেন। এবং এইভাবে দেশবাসীর মনে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির যুগ আরম্ভ হবার পরেও দীর্ঘকাল যাবত পাঠকদের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং অধ্যয়নের সহায়তা করা অব্যাহত ছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম লাইব্রেরিয়ান ছিলেন ম্যাক্‌ফারলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রাক্তন কর্মী। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের আদর্শে সাজাতে চেষ্টা করলেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল ডালহৌসি অঞ্চলে মেটকাফ হলের দোতলায়। একতলায় ছিল রয়্যাল এ্যাগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির দপ্তর। আলিপুরে সোসাইটিকে বিস্তৃত জায়গায় ব্যবস্থা করে দিয়ে সরকার সম্পূর্ণ বাড়িটি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির হাতে তুলে দেন। ম্যাক্‌ফারলেন থেকে আরম্ভ করে প্রায় ত্রিশ বছরকাল পাঠকদের বই পড়বার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। বইয়ের সংখ্যা হয়তো ছিল কম, বই কেনার টাকাও ছিল অল্প, কিন্তু যা ছিল তা পাঠকরা যাতে যথাসময়ে পায় এবং পড়তে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে গ্রন্থাগারিকের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। রীডিং রুমে উঁচু শেল্‌ফে রেফারেন্স বই থাকত। মইয়ের সাহায্যে লাইব্রেরিয়ান নিজে প্রার্থিত বইটি খুঁজে পাঠককে দিতেন। গ্রন্থাগারিকদের একটা সময় নির্দিষ্ট করা ছিল যে সময় পাঠকরা অবাধে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে তাদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। প্রয়োজন হলে বিদেশী ভাষাতেও ইংরেজী অনুবাদ করে তাদের সাহায্যও করা হত। গ্রন্থাগারে যে বই নেই অথচ পাঠকের বিশেষ প্রয়োজন সে বই অন্য লাইব্রেরি থেকে এনে দেবার ব্যবস্থা ছিল। এইসব কারণে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির পাঠক মহলে খুব খ্যাতি ছিল। পাঠক-সেবা এই ধারাটি ১৯৬০-৬৫ সাল পর্যন্ত অনেকটাই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। অবশ্য চ্যাপম্যান সাহেবের পরে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক হয়ে আসেন নি। তবু তাদের ছিল পাঠকদের সহায়তা করবার অকৃত্রিম অভিপ্রায়।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অথবা তারও অনেক আগে থেকে কলকাতায় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল। এইসব লাইব্রেরির সহায় সম্পদ ছিল কম, কিন্তু তাদের ঘিরে অনেক সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ টৈতন্য লাইব্রেরি এবং রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার বহুদিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাগারেই বিশেষ-বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহ পাওয়া যায়। সেইসব গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী ব্যক্তিদেরই চাহিদা মেটায়। কিন্তু যে সব পাঠক সাহিত্য, ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, ভ্রমণ, জীবন-কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পড়তে আগ্রহী তাদের জন্য শুধু ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার এবং নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো পাবলিক লাইব্রেরিগুলি সাহায্য করতে পারে। এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি গবেষকদের জন্যেই সহায়ক। বৃহত্তর পাঠক সাধারণ যে দুটি গ্রন্থাগারের কাছ থেকে বই পড়বার সুযোগ সুবিধা আশা করতে পারে নানা কারণে এখন তা পাওয়া যায় না। এসবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বিতর্ক উঠবে এবং সেটাই হবে একটি পৃথক আলোচনার বিষয়। ছোটো ছোটো পাবলিক লাইব্রেরিগুলি সম্পদ ও উপযুক্ত কর্মীর অভাবে ধুকছে।

পাঠক-সেবার এই অবহেলার জন্য একটা মস্ত বড় ক্ষতি হচ্ছে দেশের শিক্ষিত সমাজের। বইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের পূর্বের মত আগ্রহ নেই। ভাল বই পড়াকে অনেকেই অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন না। কারণ লাইব্রেরিতে গেলেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে বইটি পাওয়া যায় না। অথবা হয়তো যখন আকাঙ্ক্ষিত বইটি হাতে আসে তখন ক্লান্তিতে ও বিরক্তিতে মন ভরে যায়। আরেকটি বড় কথা জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রশ্নের মীমাংসা গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে প্রায়ই পাঠকের মন তৃপ্ত করতে পারে না।

অবশ্য অনেকে মনে করেন টি. ভি. সিনেমা, রেডিও প্রভৃতি চিত্ত-বিনোদনের উপকরণ মানুষের মন বই থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। বই পড়তে যে মনন-ক্রিয়া প্রয়োজন তাতে একটু পরিশ্রম দরকার কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা বা কান দিয়ে শোনার মধ্যে মননক্রিয়ার প্রশ্ন তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ। বিভূতি-ভূষণের 'পথের পাঁচালি' পড়তে পড়তে পাঠক নিশ্চিন্দিপুরের ছবিটি নিজেই কল্পনায় তৈরি করে নেয়। প্রত্যেক পাঠকের নিকটই অপুর গ্রাম ও পথঘাট নতুন নতুন রূপে দেখা দেয়। এতে কিছুটা কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এবং নিশ্চয়ই মননশক্তির প্রয়োগ দরকার। এই মানসিক পরিশ্রম থেকে আমরা মুক্তি পাই 'পথের পাঁচালির' চলচ্চিত্রায়িত রূপ দেখলে। সেখানে পরিচালক আমাদের হয়ে অপুর গ্রাম পরিবার এবং পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করে দেন, দর্শক চোখ মেললেই দেখতে পাবে, তাতে মন সক্রিয় করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

এই মতবাদ যে সঠিক নয় তার প্রমাণ য়ুরোপ-ও আমেরিকার নাগরিকদের গ্রন্থ প্রীতি। বইয়ের প্রতি এই ভালবাসা তাদের কিন্তু আপনা থেকেই হয়নি। গ্রন্থাগার কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় বই পাঠকের মন আকৃষ্ট করে; যে পাঠক গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারে না তাকে বই বাড়ি পৌছে দিতে হয়। ভালো বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রচার করে করে তাদের প্রতি মন আকৃষ্ট করা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা সর্বদাই পাঠক-সেবার জন্য প্রস্তুত ও সচেতন। ভারতবর্ষের বাইরে



অন্যান্য দেশের লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগার বিদ্যার ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীতে কর্মীর পক্ষে অত্যাবশ্যক যোগ্যতা বিবেচিত হয় না। ব্রিটিশ লাইব্রেরি ( পূর্বতন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরি ) লাইব্রেরি অফ্ কংগ্রেস, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগারে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু গ্রন্থাগারবিদ্যায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা হবে এমন কোনো শর্ত নেই। জ্ঞানের স্পৃহা ও বইয়ের প্রতি ভালবাসা না থাকলে কোনো গ্রন্থাগারিক পাঠককে সাহায্য করতে পারে না এই হল তাদের বিশ্বাস।

আমাদের এক বন্ধু ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, কোনো বিষয়ের গবেষণার জন্য। তাঁর প্রার্থিত বইটি লণ্ডনের কোনো লাইব্রেরিতে ছিল না। খবর পেলেন, সেটি আছে কিছু দূরে এক কাউন্টি লাইব্রেরিতে। সেখানে একদিন পৌছতে পৌছতে তাঁর লাইব্রেরি বন্ধ হবার সময় হয়ে গেল। তখন লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে বললেন তিনি অল্পদিনের জন্যে এসেছেন তাকে কালই বইটি দেখে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু পরদিন ছিল লাইব্রেরি ছুটির দিন, কেউ আসবে না। লাইব্রেরিয়ান সব শুনে বললেন তুমি এত দূর থেকে এসেছো তোমাকে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তুমি কাল এসো তোমার প্রয়োজনীয় বই প্রস্তুত থাকবে। দারোয়ান গেট খুলে দেবে। তুমি রীডিং রুমে বসে বই পড়ে যাবে। পরদিন আমাদের বন্ধু গিয়ে দেখেন তার প্রার্থিত বইটি ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আরও কয়েকটি বই টেবিলে রাখা আছে। আর আছে ফ্লাস্কে ভরা গরম কফি এবং কিছু খাবার। চারিদিকে শেলফ ভর্তি বই। তারমধ্যে একা একা বসে তিনি কাজ করে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দেশে এমন সহায়তা এবং সহানুভূতির কথা কদাচিৎ শোনা যায়।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দেখেই যে গ্রন্থাগারের কর্মী নির্বাচনের রীতি এদেশে প্রচলিত হয়েছে সেটি নিশ্চয়ই পাঠক সেবার পরিপন্থী হয়েছে অনেক দিক থেকে। বইয়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা না থাকলে শুধু কাগজে বিদ্যার সাহায্যে কেউ প্রকৃত গ্রন্থাগারিক হতে পারে না। বইয়ের প্রতি মমতা নেই বলেই তাদের প্রতি যত্নের অভাব, নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, পাঠক চাইলে খুঁজে পাওয়া যায় না। যথা সময়ে বই না পেয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে পাঠক হতাশা নিয়ে ফিরে আসে। এমনি করে ধীরে ধীরে পাঠকের মন থেকে বইপত্র দূরে সরে যাচ্ছে।

তাছাড়া সাধারণ পাঠকের কৌতূহল থাকে সকল বিষয়ে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় বই কেনার টাকা বরাদ্দ হয় খুবই কম। তা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের সামান্যই পূরণ করা যায়। সুতরাং পুরনো বই ধূলিধূসরিত হয়ে অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকে, তেমনি নতুন বইয়ের যোগান হয় অল্প। বাঙালী পাঠক মাতৃভাষায় বই পড়বার সুযোগ পায় খুবই কম। কারণ নানা বিষয়ের বইসহ মোট প্রকাশনের পরিমাণ সাধারণতঃ বছরে ১২০০-১৮০০টি বাংলা বই। অর্থাৎ, একটি বাংলা বই গড়ে ১,৫০০ বাঙালী সাক্ষরের জন্য প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বই পড়ে তৃপ্তি লাভ করা যায় না। হয়তো জীবিকার্জনের সহায়তার জন্য ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার বই পড়তে হতে পারে, কিন্তু অবসর কাটাবার জন্য মাতৃভাষার বই মন যেমন আকৃষ্ট করতে পারে বিদেশী ভাষার বই তেমন পারে না। অথচ বাংলাভাষায় বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে বাংলা বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টাও নেই। তাই নিরুপায় হয়ে আমাদের বিদেশী ভাষার দ্বারস্থ হতেই হয়। আর এই কারণেই উনবিংশ শতকের শেষার্ধে

আমরা যখন মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বইপত্র আমদানি করতাম এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

বর্তমান পরিস্থিতির যে কোনো পরিবর্তন ঘটবে তার লক্ষণও দেখা যায় না। শুধু সরকারী ফাইলে বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেই মাতৃভাষাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। শেষ হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের আমলে এদেশের রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। মুসলমান আমলে হল ফার্সী, ইংরেজদের রাজত্বে ইংরেজী আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে তার এখনও শেষ নেই।

বাংলা বই যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার মত যথেষ্ট সংখ্যক প্রকাশিত হবে না ততদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জনচিত্তে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সরকারের তরফে এ জন্য কোনো উদ্যোগ নেই। পরিকল্পনাহীনভাবে কিছু কিছু লেখককে নিজেদের বই ছাপার জন্য অর্থ সাহায্য করলেই বাংলা ভাষার প্রসার ঘটবে না। আমাদের দেশে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুর জন্যই পাঁচশালা পরিকল্পনা রচিত হয়। হয় না কেবল পাঠকদের চাহিদা মেটাবার জন্য বই প্রকাশের। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন জনসাধারণের হাতে বই তুলে দিতে না পারলে বিপ্লবের কার্যকারিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই রাশিয়ায় প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা থেকেই গ্রন্থপ্রকাশ ছিল অন্যতম অঙ্গ। ক্রমে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল।

বই পাওয়া সহজ নয় বলেই পাঠকের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তাই আমাদের দেশের অমূল্য গ্রন্থসম্পদ যখন বাইরে চলে যায় তখনও আমরা উদাসীন থাকি। হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে তক্ষশিলা ও নালন্দায় শিক্ষা লাভ করে ৬৩৫ সালে গাধার পিঠ বোঝাই করে সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিব্বতে অসংখ্য পুঁথিপত্র পাওয়া যায় যার অস্তিত্ব ভারতে মেলে না। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন দার্জিলিং অঞ্চল থেকে জাপানী পণ্ডিতরা বহু পুঁথি নিয়ে যাচ্ছে অথচ আমাদের দেশের লোকের সে বিষয়ে কোনো আক্ষেপ নেই। ইংরেজরা এদেশে আসবার পর যত মূল্যবান বইপত্র পেয়েছে দেশে নিয়ে তাদের পণ্ডিতদের পড়বার জন্য সঞ্চিত করেছে। শুধু ইংরেজ নয় পাশ্চাত্যের কোনো দেশই আমাদের দেশ থেকে বই ও শিল্প সামগ্রী চোরাই পথে অথবা কিনে নেবার চেষ্টা কম করেনি। সে প্রচেষ্টা এখনও চলছে, বিশেষ করে আমেরিকায়। যখন থেকে এদেশে বই ছাপা শুরু হল প্রায় তখন থেকেই এক সরকারী নির্দেশনামা জারি করে ভারত সরকার মুদ্রকদের তিন-চার কপি বই বিনামূল্যে লণ্ডনে পাঠাতে আদেশ করলেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর শাসকদের মনে প্রশ্ন জাগলো যারা আমাদের একদিন সিংহাসনে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তারা কেন এই বিদ্রোহ করলো? কে ছড়ালো এই বিপ্লবের বার্তা? ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বইপত্রে 'ডিপোর্টে'র ভূমিকায় লর্ড সাহেব লিখলেন সরকারের প্রজাদের মনোভাবের খোঁজখবর নেওয়া উচিত। এর প্রধান উপায় হল প্রকাশিত বই-পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা।

লর্ড সাহেবের এই প্রস্তাব অনুসারে ১৮৬৭ সালের প্রেস এ্যাণ্ড বুক্স রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট বিধি বদ্ধ হয় বিভিন্ন ভাষায় কী লেখা আছে তা জানবার জন্য বেঙ্গলী ট্রান্সলেটরস্ অফিস স্থাপিত হল।



আর আইনের শর্তাধীনে কয়েক কপি বই জমা দিতে হবে স্থানীয় প্রশাসকের নিকট এবং তা থেকে অন্তত দুটি কপি যাবে লণ্ডনে একটি থাকবে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আর একটি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে। বেঙ্গলী ট্রান্সলেটরস্ অফিসে এক কপি বই যেত কিন্তু সংরক্ষণ করবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি স্থাপিত হবার পর তাদের এই কপিটি পাবার অধিকার বর্তাল কিন্তু স্থান সঙ্কুলানের অভাবের জন্য মাত্র কয়েকটি নির্বাচিত বই আনা হত। বাকী বইগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য কোথায় কার হাতে চলে গেছে কোনো হদিশ নেই।

যখন তুচ্ছ বইপত্রের স্তূপ লণ্ডনের লাইব্রেরি দুটিকে বিব্রত করে তুলল তখন তারা ভারত সরকারকে বলল আমাদের আগে একটি ইংরেজীতে সব বইয়ের তালিকা করে পাঠাতে হবে। সেই তালিকায় থাকবে প্রতিটি বইয়ের বিষয়বস্তুর নির্দেশিকা; ওই তালিকা দেখে আমরা যে বই বাছাই করব সেগুলিই পাঠাতে হবে। এরপর থেকেই শুরু হল প্রতিটি বইয়ের বিবরণ দিয়ে ত্রৈমাসিক তালিকার প্রকাশ; যেটি ছিল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার অন্যতম অবলম্বন।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পরই স্থির হয় যে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বইপত্র ভারত ও পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (তখনও বাংলাদেশ হয়নি)। যে সব বইপত্র ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সেইসব বইপত্র পাবে ভারত এবং পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় প্রকাশিত বইপত্র সে দেশ পাবে। কিন্তু দুটি দেশই যে কোনও বইপত্র, ফটো, কপি পেতে পারবে যদি প্রয়োজন বোধ করে আর এক প্রস্থ ভারতীয় প্রকাশনের এবং পুঁথিপত্রের সংগ্রহ ব্রিটিশ মিউজিয়মে (ব্রিটিশ লাইব্রেরি) যেমন আছে তেমনি থাকবে। এইসব বইপত্র পুঁথি ও চিত্রকলা সংগ্রহ ফিরে পাবার নৈতিক অধিকার ভারতের ছিল। কারণ অধিকাংশই বিনামূল্যে সংগ্রহ করা হয়েছে, এমনকি জাহাজ ভাড়ার টাকাও দিয়েছে এদেশের লোক। সুতরাং এই ঘোষণাকে সকলেই স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় স্বাধীনতার এতকাল পরেও কোনো কাজ এগোয়নি। পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির সংগ্রহ ব্রিটিশ লাইব্রেরির সঙ্গে যোগ করে দিয়ে গ্রন্থাগারটি নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছে। ঐ লাইব্রেরির এক কর্মীর কাছে শুনেছি যে ভারত ও পাকিস্তানের নীরবতার ফলে সেখানে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার নাকি উভয় সরকারকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়েছিল; পাকিস্তান কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি ভারত কী উত্তর দিয়েছিল, তা জানা যায়নি।

আমাদের এই যে অমূল্য সম্পদ নিঃশব্দে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল তার জন্য আমাদের বিদ্বদ্‌জ্জনের মধ্যে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে প্রকাশিত বাংলা বই নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করতে চান তাহলে তাঁর লণ্ডনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। কত চিত্তিত বাংলা পুঁথি, কত কৌতূহলোদ্দীপক আজানা বাংলা বই ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে যাদের খবর আমাদের জানা নেই অথচ জানা থাকলে আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হতে পারত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে: ১৮৬৭ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যে সব বাংলা বই প্রদর্শিত হয়েছিল তাদের একটি ক্যাটালগ সংকলিত করেছিলেন লর্ড সাহেব। এই ক্যাটালগটিতে দেখা যায় কলকাতা থেকে চার খণ্ডের একটি

ছবির এ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল। এ্যালবামের ছবিগুলির বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক ও সামাজিক। বিশেষ করে সামাজিক ছবিগুলি যে বিশেষ মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় এই চিত্রসংগ্রহের সন্ধান এখানে কোথাও পাওয়া যায়নি।

প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারেও অনেকগুলি বাংলা পুঁথি আছে। পোর্তুগাল থেকে ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান আবিষ্কার করেছিলেন। জার্মানী এবং অন্যান্য দেশেও কিছু কিছু বাংলা পুঁথি ও বই পাওয়া যায়। ভারত সরকার রাধবনকে বিদেশে পাঠিয়ে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান যে ভাবে করিয়েছিলেন বাংলা বইপত্রের জন্য তেমন অনুসন্ধান চালাবার মত কারও আগ্রহ নেই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য ভবিষ্যতে গবেষকদের যেতে হবে আমেরিকায়। কারণ সেখানে নির্বাচিত বাংলা বইয়ের আঠারো কপি করে কিনে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস এবং অন্য কয়েকটি লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করা হয়। যদিও ১৯৫৪ সালে ডেলিভারি অফ্ বুক্স্ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়েছে তথাপি তার প্রয়োগের দিকটা এতই দুর্বল যে চারটি লাইব্রেরি এই আইনের দ্বারা উপকৃত হবার কথা তাদের সংগ্রহে অনেক বই জমা পড়েনি। সুতরাং স্বাধীনতার এতদিন পরেও বাংলা বইয়ের একটি সামগ্রিক সংগ্রহের কেন্দ্র গড়ে উঠলো না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক ও গবেষক এজন্য আমাদের ক্ষমা করবে না।

কলকাতা শুধু প্রাসাদপুরী নয় একদা গ্রন্থপুরীও ছিল। বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল এই শহরে, যা পাঠককে অপূর্ব সুযোগ দিত জ্ঞানচর্চার। পারিবারিক সংগ্রহে এইসব বইপত্র এখন প্রায় সবই হারিয়ে গেছে বলা যায়। কিছু গেছে বিদেশে অল্পটাকার বিনিময়ে কিছু বা গেছে বাংলার বাইরে। এখানে কেউ আগ্রহ করে তাদের সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করেনি। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন আমাদের সরকার জনসাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করতে চান তাহলে আর কোথা থেকে দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করবেন! ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য অপরিহার্য গ্রন্থসম্ভারসমূহ একে একে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো আমাদের কর্তব্য স্পষ্টতর হবে: ডঃ সুশীলকুমার দের মূল্যবান সংগ্রহ এখন ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের পাঠকেরা পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ সংগ্রহ এখন ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কোনো পাথুরিয়া ঘাটার রাজবাড়ির বিচিত্র সংগ্রহ চলে গেছে আমেরিকায়। সংগ্রহে এমন সব বই ছিল যা জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই এবং আমরা তাদের নামও শুনিনি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস গ্রন্থের সংগ্রহ আছে সিমলার ইনস্টিটিউটে। এই সংগ্রহ চলে যাবার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ায়; নীহারবাবু শুনে ছুটে গেলেন রমেশ চন্দ্রের বাড়ি, তিনি তখন সিমলার ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর। তিনি বললেন আমাদের দিলে বইগুলি ভারতেই থেকে যাবে। দাম অনেক কম হলেও রমেশ চন্দ্র তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। বিনয় ঘোষের ২৫,০০০ বইয়ের সংগ্রহ; তাতে ছিল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'হিকির গেজেটে'র একটি চমৎকার কপি (প্রথম খণ্ড)। তিনি বলেছিলেন আমি মাত্র ৩০,০০০ টাকা পেলে বিক্রি করব যদি দেশে থাকে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে বলা হল কিন্তু



তাদের এক কথা টাকা নেই। অথচ ঠিক সেই সময় লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশী বই কিনে চলেছিল তাদের লাইব্রেরি। এও শোনা যায় বিনয় ঘোষ এদেশে ক্রেতা না পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার তাঁর বই বিক্রি করে দিয়েছিলেন কয়েক গুণ বেশী দামে।

১২৪৬ সালে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার তদন্ত করবার জন্য একটি কমিশন বসানো হয়। কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণ হবার পর তার ছাপাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলে তিনি বললেন, এ রিপোর্ট এখন প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই। বরং ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং তাঁর নির্দেশে রিপোর্টের সকল কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঐ কমিশনের যিনি সম্পাদক ছিলেন তাঁর কাছে দুটি কপি ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকজন পুরনো বইপত্রের সঙ্গে ঐ রিপোর্ট দুটিও পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেয়। সেই দোকানের মালিকের কাছ থেকে শুনেছি যে রিপোর্ট দুটি হাতে পেয়েই কলকাতার এক বিখ্যাত লাইব্রেরির তদানীন্তন এক অবাঙালী গ্রন্থাগারিককে টেলিফোন করে বিষয়টি জানান। তিনি সাফ জবাব দেন আমরা মোটেই আগ্রহী নই। এরপর দুটি কপিই আমেরিকার কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কিনে নিয়ে যায়।

এখানকার পাঠকদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ব্যবহারের পথে যে সব নিয়মকানুনের বাধা এবং কর্মীদের উৎসাহের অভাব তারই ফলে সাধারণ লোক থেকে সরকারের উচ্চতর মহল পর্যন্ত সর্বত্র বইয়ের প্রতি চরম অবহেলার মনোভাব দেখা যায়। তাই অবাধে দুষ্প্রাপ্য বইপত্র দেশের ভাণ্ডার শূন্য করে বিদেশে চলে যায়। অবহেলায় দেশের গ্রন্থাগারে দুর্লভ বই ও পত্রিকা ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের সংরক্ষণের জন্য যে সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে তা করা হয় না।

এখনকার মনোযোগী পড়ুয়ারা নানা বাধার সম্মুখীন হন, ভবিষ্যতে সেই বাধা হবে আরও অনেক বেশী এবং জাতির পক্ষে তা ক্ষতিকর।

# আমাদের শিশুসাহিত্য

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

"ই রথেতে যাব না, ফিরকি রথে যাব,
সিকি পয়সার মুড়কি কিনে বাপ-ব্যাটাতে খাব।"

ছেলে-ভুলানো এই ছড়ায় দারিদ্র্যের এক করুণ ছবি ফুটে উঠেছে। বাবা ছেলেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তাকে তিনি নিয়ে যাবেন উল্টোরথের মেলায়। দু'জনে মিলে মুড়কি কিনে খাবেন। বাবা গরীব। ছেলেকে রথের মেলায় নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই তিনি তাকে উল্টোরথের মেলায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ভুলিয়ে রাখছেন। ছেলে-ভুলানো ছড়া, তবু এরই মধ্যে ধরা পড়েছে বাংলার দীনদুঃখী মানুষের চিরন্তন অভাব ও কষ্টের ছবি।

মুখে মুখে এইসব ছড়া ছড়িয়ে আছে সেই কোন কাল থেকে। কারা এগুলি লিখেছেন, কখন লিখছেন তার কোনও ইতিহাস নেই। থাকার কথাও নয়। লোকমুখে প্রচলিত থেকেই এগুলি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। ছড়া সংকলন করেছিলেন নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, করেছিলেন কমলকুমার মজুমদার। না হলে অনেক ছড়াই হয়তো হারিয়ে যেত।

যে সময় এই ছড়াগুলি রচনা করা হয়েছিল, সেই সময়কার বাংলাও কি আর আছে? গ্রামের ঘরের চালাঘরে এখন কোথাও কোথাও দেখা যায় টিভির অ্যান্টেনা। কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। মোপেড, মোটর সাইকেল, ভিডিও—কী নেই আজকের বাংলায়। হারিয়ে যায়নি শুধু দারিদ্র্য। গ্রামের মানুষ সবাই যে দুধে-ভাতে আছেন, তা মনে করারও কোনও কারণ নেই।

এরই মধ্যে চলছে সাক্ষরতা অভিযান। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি। কেরলের প্রতিটি মানুষই তো সাক্ষর বলে দাবি করা হচ্ছে। আমাদের মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলাও পিছিয়ে নেই। গ্রামাঞ্চলে বেড়েছে প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়েনি, এমন তো নয়। বাড়েনি শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিংবা বাড়লেও তার সহায়-সম্বল তেমন নেই। কাগজে কলমে বলা হয়, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। কিন্তু শিশুদের সত্যিকারের শিক্ষা কিংবা সুস্বাস্থ্যের জন্য এখনও তেমন চেষ্টা হল না। আমরা যে শিশুসাহিত্যের কথা বলি, এই পরিপ্রেক্ষিতে তা যে অধিকাংশ শিশুর কাজেই পৌঁছয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। শিশু আছে, কিন্তু তাদের শৈশব নেই। শিশুশ্রমিকের সংখ্যাও যে কত বেড়েছে, সেদিকে একটু নজর রাখলেই সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারব, বেশির ভাগ শিশুর হাতেই আমরা আনন্দের উপকরণগুলি এখনও তুলে দিতে পারছি না।

ছেলেভুলানো ছড়াই শুধু লেখা হোত না, শিশুদের জন্য কত রকমের খেলনাও যে তৈরি হত, তারও লেখাজোখা নেই। পোড়ামাটির পুতুলরা সব কি হারিয়ে গেল? মুর্শিদাবাদের কাঁটালিয়ার পুতুল আর চোখে দেখি না কেন? ওইসব পুতুল যেন এক একটা জীবন্ত চরিত্র। ঘরকন্নার ছবি তাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত। মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন মা, কেউ হয়তো জাঁতা পিষছেন, আর কেউ



হয়তো হাতি কিংবা ঘোড়ার পিঠে চেপে কোথাও উধাও হয়ে যেতে চাইছেন। কোলের বাচ্চাকে আদর করছেন মা সেই পুতুলও দেখেছি। কাঁটালিয়ার পুতুলের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে বীরভূমের রাজনগরের পুতুলও। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের মন্মথনাথ দাশ মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। রেখে গেছেন পুতুল তৈরির পুরনো অনেক ছাঁচ। তাঁর ভাইপো পাঁচুগোপাল দাশ সেই ছাঁচে এখনও পুতুল গড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ পুতুল আর খেলনা-পুতুল নয়, এ পুতুল নিয়ে ছেলেমেয়েরা আর খেলে না। এগুলি সাজিয়ে রাখা হয় যাদুঘরে, কিংবা আপাতসৌখীন কোনও মানুষের বৈঠকখানায়। মাটির পুতুল হাতে নিয়ে বাংলার মাটির সঙ্গে প্রাথমিক একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার যে সুযোগটুকু ছিল ছেলেমেয়েদের, তাও হয়তো হারিয়ে গেল। দুঃখ করে লাভ নেই। প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তন মেনে নিতেই হয়। কিন্তু দুঃখ অন্যখানে। এত তাড়াতাড়ি কি এই পরিবর্তন কাম্য ছিল? যা হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য, তার বদলে আমরা কী পেলাম? যা পেয়েছি, তা ভালো, না মন্দ? আধুনিকতার হুজুগে ভাসতে ভাসতে একটা কথাই শুধু মনে হয়। শিশুদের কল্পনাশক্তি নষ্ট করে দেওয়ার কোনও অধিকার আমাদের নেই। এর চেয়েও খারাপ একটা অবস্থার সাক্ষী আমরা অনেকেই। শিশুদের যাঁরা বড় বেশি শিশু বলে মনে করেন, তাঁরাও অপরাধের বোঝা বাড়িয়ে যাচ্ছেন ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে। শিশুদের কাছে অদ্ভুত এক গোপনীয়তা তাঁরা রক্ষা করে চলেন। শিশুদের সঙ্গে তাঁদের আচার-আচরণেও সংরক্ষণশীল মনোভাবই প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ আজকের শিশুদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক খোঁজ-খবর পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত জরুরি। পিঁপড়ে কামড়ালে জ্বালা করে কেন, লুচি কেন ফোলে, কিংবা রামধনুর ক'টা রং আছে—এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর জেনেই তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না, তারা জানতে চায় লেজার কী, কীভাবে তৈরি হয়, ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে কীভাবে গড়ে তোলা যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, কিংবা কম্পিউটার কী পারে, কী পারে না—এ ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর। জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিংয়ের খুঁটিনাটি খোঁজখবরও তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দরকার আছে। যদি এ-ধরনের বিভিন্ন তথ্য থেকে তাদের একেবারে গোড়া থেকেই বঞ্চিত রাখি, তাহলে আগামী দিনে শিশুই হবে মানসিক দিক থেকে পঙ্গু। আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে সে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। উন্নত দেশের শিশুদের চেয়ে সে পড়বে পিছিয়ে। কারণ, উন্নত দেশ শিশুদের কাছে সবকিছু গোপন করতে চায় না। দেশের কাজে একেবারেই গোড়া থেকেই তারা শিশুদের শরিক করে নেয়।

আমাদের মনোভাব রক্ষণশীল বললেও ভুল বলা হবে। ক্ষেত্রবিশেষে রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা ভুগি গোঁড়ামিতে। প্রশ্ন হল, এই গোঁড়ামির মূল্য কেন আমাদের শিশুদের দিতে হবে? রক্ষণশীলতার চেয়েও খারাপ, অনেক খারাপ হচ্ছে গোঁড়ামি। শিশুদের জন্য তথাকথিত যেসব পত্রিকা বেরোয় সেগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, গোঁড়ামি কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। সাধারণ কয়েকটা গল্প, সাদামাটা কয়েকটা ছড়া, কিংবা কবিতা, এবং তার সঙ্গে বোকা বোকা কিছু কমিক্স—এই হল আমাদের শিশু পত্রিকাগুলির মূল উপকরণ। বিজ্ঞান যে নেই তা নয়। কিন্তু তা এমনই মান্ধাতা আমলের যে নতুন পৃথিবীর কোনও খোঁজখবরই সেখানে ধরা পড়ে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিশু সাহিত্যকেও বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। 'ভোম্বল

সর্দার-এর মতো সাহিত্য আর সৃষ্টি হয় না, কারণ এই ভোম্বলের সঙ্গে আজকের শিশুসাহিত্যিকদের কোনও পরিচয় নেই। তাঁরা শিশুদের মন ভোলানোর সহজ একটা রাস্তা বেছে নিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন রহস্য রোমাঞ্চের গল্প, কিংবা গোয়েন্দা গল্প উপজাসই শিশুদের বেশি আকৃষ্ট করে। সেইজন্য তাঁদের গল্পে এসে যায় স্মাগলার, হীরে-চোর, বাটপাড়, ঠগ ও এ ধরণের আরও অনেক চরিত্র। এঁদের গল্পের পাতায় পাতায় বন্দুকবাজদের ভিড়। আর কেউ কেউ লেখেন আধুনিক রূপকথা—কল্পবিজ্ঞান! কোথাও কিন্তু কল্পনার ছিটেফোঁটাও নেই।

এই লেখকেরা একটা ফর্মুলা বের করেছেন। কল্পবিজ্ঞানের গল্প মানেই রোবট ও মহাকাশের গল্প। গোয়েন্দা গল্প মানেই চোরাচালান। এবং এই চোরাচালানদের পিছু ধাওয়া করতে করতে গোয়েন্দা তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নতুন নতুন জায়গায় পাড়ি দেয়। কখনও সমুদ্রসৈকতে, কখনও পাহাড়ে, কখনও বা বিদেশে। এভাবে একটা ভ্রমণকাহিনীরও আমেজ আনা যায় লেখায়। এই এই ধরনের ফর্মুলা শিশুরা মন দিয়ে গ্রহণ করেছে কি না জানার উপায় নেই, কিন্তু একটা কথা ঠিক। ফর্মুলার একটা তাৎক্ষণিক সাফল্য এনে দিতে পারে। এবং একবার যখন সাফল্য রাতারাতি এসে যায়, তখন আর লেখকরা অন্য পথে চলতে চাইবেন না। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এটাই সাধারণ মনস্তত্ত্ব। তাই আজকের শিশুসাহিত্যের অনেকটাই হয়ে যাচ্ছে ফর্মুলানির্ভর। কিংবা বলা যেতে পারে ফর্মুলাসর্বস্ব।

আর একটা বিষয় লক্ষণীয়। শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি আমরা এখন পেয়েছি কিশোরসাহিত্য। কিন্তু কিশোরীদের তেমনভাবে আমরা দেখতে পাই না। এই ধরনের সাহিত্যে সাধারণভাবে নারীচরিত্র প্রায় অনুপস্থিত। আমাদের শিশু ও কিশোর সাহিত্যে মা, বোন বা দিদিদের দেখা যাবে। কোথাও কোথাও দেখা যায় দিদিমা বা ঠাকুমাকে। কিন্তু শিশু বা কিশোরের কোনও বান্ধবীকে, কিংবা সহপাঠিনীকে আমরা দেখতে পাই না। এখানেও আমাদের মনের একটা চাপা সংস্কার কাজ করে। শিশু ও কিশোরের ভালোবাসারও একটা পৃথিবী থাকতে পারে, এবং থাকেও। এবং সেখানে একজন সহপাঠিনী কিংবা পরিচিতা কোনও কিশোরীকেও আমরা কোনও না কোনও ভূমিকায় দেখতে পারি। অথচ বাস্তবে যা-ই ঘটুক, শিশু ও কিশোর সাহিত্যে তার ছায়া পড়ে না। এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে কাজ করে না কোনও আধুনিক মনন ও মানসিকতা। শিশু ও কিশোররা গল্প পড়তে চায়। নির্ভেজাল গল্প। কিন্তু সেই গল্পের বিষয়বস্তু, নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে আমরা বেঁধে রেখে দিয়েছি। ধরে নিয়েছি, শিশু ও কিশোররা এটাই চায়! তাদের আমরা নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি না। চেষ্টা করলে হয়তো দেখা যেত, সেই লেখাও শিশু কিশোররা আগ্রহের সঙ্গে পড়ছে। আর তখনই একধরনের সাহিত্যের একটা চাহিদা সৃষ্টি হত। এই সাহিত্যও পেত সমাদর। কিন্তু আমরা অনেকেই এটাকে বিপজ্জনক ঝুঁকি বলে মনে করি। আসলে কিন্তু ঝুঁকি নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। শিশু ও কিশোরদের আমরা যেভাবে গড়ে তুলতে চাই, তারা সেভাবেই নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তাদের জন্য আমরা নতুন কিছু করলে, তারা নিশ্চয় তাকে স্বাগত জানাত। আমরা নতুন কিছু করার রাস্তাটাকেই অবরুদ্ধ রেখে দিলাম।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুদের মনোবিকাশে সাহিত্য আলাদাভাবে কোনও ভূমিকা



নেওয়ার ক্ষমতা রাখে কি না। হয়তো রাখে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই এটা উচিত নয়। শিশুদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ। এই কৌতূহলই শিশুদের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও শিল্পের চর্চায় অনেকটা পথ এগিয়ে দেয়। কিন্তু কৌতূহলের এলাকা অতিক্রম করে আমরা নিজেরাই যদি তাদের সরাসরি জ্ঞান দিতে শুরু করি, গল্পের ছলে দিতে থাকি নানা ধরনের উপদেশ, তা হলে শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশের মানসিক প্রক্রিয়াটিকেই আমরা প্রভাবিত করব, একই সঙ্গে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেব আমাদের শিশুসাহিত্যকে। শিশুদের জন্য সাহিত্য লিখতে গিয়ে এভাবে অনেকে শুধু সাহিত্যেরই ক্ষতি করেন নি, নিজেদেরও ঠেলে দিয়েছেন সর্বনাশের পথে।

শিশুরা যে কীভাবে প্রভাবিত হয় তার একটা ভালো উদাহরণ আছে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দার' বইয়ে: "আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন ছেলেদের নিয়ে পাড়ায় মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। ব্যাপারটা যে শোনে সেই প্রথমে অবাক হয়: তারপর ভয়ঙ্কর রেগে ওঠে; বলে– "ছেলেগুলোর কঠিন শাস্তি দরকার; দেশশুদ্ধ জ্বালালে।"

ছেলেরা কী করেছিল সেদিন? "কেউ কাপড় চিবোতে চিবোতে বললে—" কি করে? এই ভোম্বোলদা, না, ভোম্বলা—সেদিন আমরা বাজারে বায়োস্কোপে জলযুদ্ধের ছবি দেখে এলে, সকলকে বললে, 'কাল আমরাও ঐরকম জলযুদ্ধ করবো।' রাখাল বললে, 'জাহাজ পাবে কোথা?' ভোম্বোলদা বললে, 'জাহাজের আবার ভাবনা? কাঠগোলার মজুরদের ডিঙি দিয়ে যুদ্ধ হবে।'

মাঝগাঙে দু'খানা ডিঙি নিয়ে ছেলেরা যুদ্ধ করেছিল। ভোম্বল সর্দার তার প্রতিপক্ষের ডিঙিটা উলটে দিয়েছিল। স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিল সেই ডিঙি। যারা সেই ডিঙিতে ছিল তারা কেউ কেউ সাঁতরে ভোম্বোলের ডিঙিতে গিয়ে উঠল। ভোম্বোল বলেছিল, "আমি সেনাপতি। সকলে না রক্ষা পেলে আমি উঠব না।" সে লালু আর মোংলার সঙ্গে সাঁতারে গিয়ে জেলেপাড়ার ঘাটে উঠেছিল।

বায়োস্কোপে জলযুদ্ধের ছবি সত্যিই আজকের শিশুদের এভাবে প্রভাবিত করবে কি না সন্দেহ। কারণ, জল ও জাহাজ দুটোই তাদের কাছে সুলভ নয়। তারা ভোম্বল সর্দারের গ্রামের ছেলেও নয়। কিন্তু ঘুনোঘুনি ও মারপিটের ছবি তাদের প্রভাবিত করতে পারে। শিশুর অবচেতন মনে এমনভাবে তা প্রভাব ফেলবে যে, বছরের পর বছর তা তাদের মনের গোপনে থেকে গিয়ে কৈশোরে বা তারও দূরে আরও মারাত্মকভাবে ফেটে পড়তে পারে। কিংবা শৈশবেই তার বীভৎস চেহারাটা কোনও না কোনওভাবে প্রকাশ পাবে। শিশুরা, দেখুক, জানুক, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিক। কিন্তু আমরা যেন কোনওভাবেই তাদের উত্তেজিত না করি।

এবং এটাও ঠিক, আমাদের শিশু ও কিশোররা আর শঙ্খমালা, মধুমালা কিংবা কাঞ্চনমালার যুগে নেই। নেই পুষ্পমালা মালঞ্চমালার যুগ। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর 'ঠাকুরমা'র ঝুলি বইটিকে বলেছিলেন, "ধূলি-কুড়ানো ফুলের অর্ধা-ভাঙা বাঙলার রূপকথা"। এই রূপকথায় কত কী-ই না ঘটে। কাঁঞ্চনমালা জল্লাদকে ডেকে বলে, "দাসীর আর ওই নির্বংশের গর্দান নাও। ওদের রক্তে আমি স্নান করব, তবেই আমার নাম কাঁঞ্চনমালা।" এই রূপকথায় আছে অনেক রাজা অনেক রানী। মন্ত্রী, মন্ত্রীর ছেলে, রাজপুত্র। এবং সে এক আশ্চর্য কল্পনার জগৎ। "লকলকে' চকচকে' কোটি রঙের

কোটি সাপ ভিঙ্গাইয়া, সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন। সেখানে সাপের দেওয়াল সাপের থাম, 'সাপের মেজে সাপের বাড়ী, সাপের মণির দেওয়ালগিরি'—লক্ষ সাপের শয্যায় মণিমালা রাজকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন।" এই বর্ণনা, এই পৃথিবী আমরা আর কোথায় পাব।

দক্ষিণারঞ্জনের এই লেখা কাদের জন্য? সব বয়সের পাঠকদের জন্যই, তিনি বলেছেন। আর তাই প্রেম ভালোবাসার কথাও তিনি লিখতে ভোলেননি। তবে এ গল্পের ভাষা তাঁর একান্তই নিজস্ব। কোথাও কোনও উত্তেজনার ছাপমাত্র নেই। জল্লাদকে ডেকে কেউ যখন কারও গর্দান নেওয়ার কথা বলে, কিংবা বলে "ওর রক্তে আমি স্নান করব" তখনও হিংসার বিষ আমাদের মন দূষিত করে তোলে না। রূপকথা কিন্তু তার আড়ালে আছে বাস্তব।

জলজ্যান্ত এই বাস্তবকে শিশু ও কিশোরদের সাহিত্যে স্থান দেওয়ার সময় তার সঠিক ভাষাটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। গ্রাম বাংলার অক্ষম পিতা তাঁর ছেলেকে রথের মেলায় নিয়ে যেতে পারেননি, তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, ভুলিয়ে দিয়েছেন তার মন। এই অক্ষম পিতার সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু অত্যন্ত প্রবল। তিনি তারজন্য প্রয়োগ করেন স্নিগ্ধতার ভাষা তিনি জয় করে নেন ছেলের মন। তিনি হয়তো উলটোরথেও ছেলেকে নিয়ে যেতে পারবেন না। সিকি পয়সার। মুড়কি কেনার ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবু তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন ছেলেকে। এই পিতা আমাদের সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক হতে পারেন।

আমাদের পুঁজি যা-ই হোক, পাঠকদের কাছে কখনও যেন আমাদের অক্ষমতা ধরা পড়ে না যায়। শিশু ও কিশোররা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল—এই কথাটা মনে রাখলে আমাদের কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙিয়ে, এমনকি সাপের ওপর দিয়ে হেঁটেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

# বাঙালীর সাংবাদিকতা—মধ্যপর্বের এক যুগ

( ১৮৬০—১৮৭২ )

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ইতিপূর্বে বাঙালীর সাংবাদিকতার আদিপর্ব ( ১৮১৮—১৮৬০ ) বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ( সমকালীন, কার্ত্তিক ১৩৯৬ ), এবার পরবর্তীকালের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিষয়টি আলোচিত হবে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বাঙালী সম্পাদিত সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি জীবিত ছিল—দৈনিক প্রভাকর—সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত ( ১৮৫৯ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ), দৈনিক সংবাদ-পূর্ণ চন্দ্রোদয় ( সম্পাদক উদিতচন্দ্র আঢ্য ১৮৭০ পর্যন্ত ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ( মাসিক—সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ) পরবর্তীকালে ১৯০৮ পর্যন্ত এটি অযোধ্যানাথ পাকড়াসী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছটি খণ্ড প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ এটি পুনরুজ্জীবিত করেন কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরই এটি বন্ধ হয়ে যায় (বৈশাখ—অগ্রহায়ণ)। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুকূল সমালোচনা প্রকাশের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি এই উৎকৃষ্ট পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করিয়ে দেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পরেও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত সমাচার চন্দ্রিকা দ্বি-সাপ্তাহিক রূপে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়েছিল ( সম্পাদকের নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, স্বত্বাধিকারী ভগবতী চট্টোপাধ্যায় ২৭—১ চুনাগলি লেন কলিকাতা। নন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত ( প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬ ) নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা নামক পাক্ষিক পত্রিকাটি ১৮৫৪ থেকে মাসিকে পরিণত হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি জীবিত ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে একটি বৈভাষিক বাংলা ও হিন্দী দৈনিক পত্র প্রকাশ সুরু হয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্যামসুন্দর সেন, ইনি বিচক্ষণ ও ফার্সী ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন বলে জানা যায়। টুকিটাকি সংবাদ, বাজার দর, জাহাজের খবর ছাড়াও এতে নানারকম রাজনৈতিক মন্তব্য থাকত, রাজপুরুষদের সম্বন্ধে কটু মন্তব্যও এতে বাংলায় ও হিন্দীতে প্রকাশিত হত, এক হিসাবে এইটিকে হিন্দী ভাষার প্রথম দৈনিক পত্র বলা চলে। বড়বাজার অঞ্চল থেকে এটি প্রকাশিত হত। সিপাহী বিদ্রোহ কালে কোম্পানীর বিপক্ষে বা সিপাহীদের পক্ষ নিয়ে কিছু লেখার বিরুদ্ধে বড়লাট ক্যানিং একটি আইনজারী করেন ( প্রেস য়্যাক্ট নং ১৫, জুন ১৮৫৭ )। দুটি ফার্সী কাগজ দূরবীন ও সুলতানউল আকবর ও 'সমাচার সুধাবর্ষণ' এই 'গ্যাগিং য়্যাক্ট' নামে খ্যাত আইনের কোপে পড়েছিল। ফার্সী ভাষার কাগজের দুই সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পান। নির্ভীক শ্যামসুন্দর সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত মামলা লড়ে আইনের ফাঁকে মুক্তি পেয়ে যান। অনেকের ধারণা যে সমাচার সুধাবর্ষণ এরপর বন্ধ হয়ে যায়। ধারণাটি অবশ্যই ভুল, ১৮৬০-থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়—সমাচার সুধাবর্ষণ কলকাতার ২৩ নং আমড়াতলা স্ট্রীট থেকে শ্যামসুন্দর সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। একটি সূত্র থেকে জানা যায় এটি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিলেন।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সদাদ ভাস্কর সাপ্তাহিক রূপে ১৮৩৭ থেকে প্রকাশিত হত। ১৮৪৯ থেকে এটি সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে অপুত্রক গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁর পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য এই পত্রিকাটি ১৮৬৩ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত রেভাঃ লালবিহারী দে ( ১৮২৪—'৯৪ ) ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 'অরুণোদয়' নামে একটি উৎকৃষ্ট সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। এটি শ্রীরামপুরের তমোহার যন্ত্রে মুদ্রিত হ'ত। কিছুকাল পর এটি সাপ্তাহিক পত্ররূপে এবং আরও পরে এটি দ্বি-সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হত, সম্ভবতঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ পরবর্তীকালের সরকারী রিপোর্টে এর উল্লেখ নেই। এই পত্রিকায় হিন্দুদের জাতিভেদ সমস্যা, জমিদারদের প্রজা শোষণ এবং ইংরাজদের শাসন নীতিরও সমালোচনা করা হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত সোমপ্রকাশ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে তাঁর বাস বাটি সোনারপুর ষ্টেশনের নিকটবর্তী চাংড়িপোতা গ্রাম থেকে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হত। ১৮৭৮ এ ভার্নাকুলার প্রেস য়্যাক্ট প্রবর্তনের পর রাজদ্রোহের অভিযোগে মুচলেকা ও অর্থদণ্ড দানে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য সোমপ্রকাশের প্রকাশ কিছুকাল স্থগিত ছিল। পরে সরকারী হস্তক্ষেপে ও সরকারের পূর্ণ সম্মতি পেয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোমপ্রকাশ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় পুনরায় কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর বাঙালীর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অতীব গৌরবপূর্ণ সোমপ্রকাশও কার্যত মৃত হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এটি কিছুকাল জীবিত রেখে ছিলেন। কিছুকাল পর এটি হস্তান্তরিত হয়ে সহচর বা নব বিভাকর নামক কোন একটি সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের পরিবর্তে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'সংবাদ দ্বিজরাজ' সাপ্তাহিক পত্র প্রভাকর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়, এর সম্পাদকরূপে ঈশ্বর গুপ্তের ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র গোঁসাইদাস গুপ্তের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই পত্রটি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পর আর প্রকাশিত হয়নি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা থেকে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় 'পরিদর্শক' নামে একটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ লেখক অভিজ্ঞ সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪২—১৯০৬ ) প্রথমাবধিই এই কাগজের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ভুবনচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। দৈনিক সংবাদপত্ররূপে 'পরিদর্শক' প্রথমাবধিই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪৪—'৭০ ) প্রথমাবধিই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর থেকে স্বয়ং কালীপ্রসন্ন এর আর্থিক দায়িত্ব ও সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন—কয়েক মাস মাত্র পরেই পাঠক সমাজের অসহযোগিতার জন্য ক্ষুব্ধ কালীপ্রসন্ন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ( অবিভক্ত বঙ্গের ) যশোহর জেলার পলুয়া-মাওরা গ্রাম থেকে "অমৃত-প্রবাহিনী" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারিত হয়, এতে স্থানীয় সংবাদ ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হত। উত্তরকালের সুবিখ্যাত সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ ( ১৮৪০-১৯১১ ) ও মতিলাল ঘোষের



( ১৮৪৭—১৯২২ ) অগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ এই পত্রটি সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাটি প্রায় চারি বৎসর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অমৃতপ্রবাহিনীর জন্য যে যন্ত্রটি কেনা হয়েছিল সেই যন্ত্র থেকেই অতঃপর ঘোষ ভ্রাতৃগণ, অমৃতবাজার পত্রিকা ( ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮ ) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঘোষ ভ্রাতৃগণ তাঁদের পালুয়া মাওরা গ্রামের নাম তাঁদের মাতা অমৃতময়ীর নামানুসারে নাম রাখেন 'অমৃত বাজার'। অমৃতবাজার নামের এই তাৎপর্য। 'হিন্দু-প্যাট্রিয়টের' সংবাদদাতারূপে শিশিরকুমার ইতিপূর্বে সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অপর এক ভ্রাতা হেমন্তকুমার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশে তাঁকে সাহায্য করতেন। এক বৎসর পরে ( ফেব্রুয়ারী, ২৫, ১৮৬৯ ) থেকে এর কিছু অংশ ইংরাজী ভাষায়ও প্রকাশিত হত। ১৮৭২ থেকে এটি রীতিমত দ্বিভাষিক পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশ করতে থাকেন। এটি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে, কারণ এটি জন্মকাল থেকেই ইংরাজ-শাসনের শোষণ ও তার অবসানের চেষ্টায় ব্রতী হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাংলা পত্র-পত্রিকা দমনের জন্য যে কঠোর আইন প্রবর্তন করেন, সেটি এড়াবার জন্য এটি প্রায় রাতারাতি ইংরাজী সংবাদপত্রে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে অমৃতবাজার ইংরাজী দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছিল ( দ্রঃ অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মকথা—মৃণালকান্তি ঘোষ, পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ )। অমৃতবাজার পত্রিকার কথা পরে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'এডুকেশন গেজেট' ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, রেভাঃ ও ত্র্যান স্মিথ নামতঃ এর সম্পাদক। নামেই প্রকাশ যে এটি মূলতঃ শিক্ষা-সংক্রান্ত কাগজ ছিল, তার প্রবর্তকেরা বাঙালী ছিলেন না। তবে এর সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭—৮৭ ) কানাইলাল পাইন ও ব্রজমোহন মল্লিকও এই পত্র সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত এটি বাঙালী পরিচালিত পত্রিকাতে পরিণত হয়েছিল, এই জন্য এর উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষা বিভাগ এটির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ফাষ্ট্রবুক-খ্যাত অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার ( ১৮২৩—'৭৫ ) কে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সবেতন এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। সরকারী-বেসরকারী সব প্রকার সংবাদই এই পত্রিকায় ছাপা হত। প্যারীচরণকে এই পত্র সম্পাদনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্যারীচরণ এই পদ গ্রহণ করে দুই বৎসরের অধিককাল এটি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে সত্যসন্ধ শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই পদ ত্যাগ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ঈষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে রেল দুর্ঘটনায় প্রায়, তিনশত লোক নিহত হয়। রেলকর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারী রিপোর্টে এই ঘটনাকে বেশ লঘুভাবে প্রচার করা হয়েছিল। প্যারীচরণ প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা এবং দুর্ঘটনার পর আহত যাত্রীদের প্রতি রেল কর্তৃপক্ষের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী নিজে অনুসন্ধান করে এডুকেশন গেজেটের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঐ রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত ছিল। সরকারী এডুকেশন গেজেটে সত্যসংবাদ

প্রকাশ পাওয়ায় এতে সরকারকে বেশ বিব্রত হতে হয়, এই জন্য সরকারী তরফ থেকে প্যারীচরণের প্রতিবেদনের সত্যতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। প্যারীচরণের আত্মসমর্থনমূলক প্রতিবেদন সরকার গ্রহণ না করাতে প্রতিবাদ স্বরূপ প্যারীচরণ সম্পাদকপদ ত্যাগ করেন। অতঃপর সরকারের পক্ষ থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে এর সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। গভর্ণমেণ্ট সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে পত্রখানির সম্পাদনভার ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (১৮৮৭—'৯৪) দিতে সম্মত হওয়ায় ভূদেব স্বাধীনভাবে এর সম্পাদনা ও পরিচালন ভার গ্রহণ করেন—১৮৬২ ডিসেম্বর মাস থেকে ভূদেবের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেটের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, সংবাদ ব্যতীত এতে ভূদেবের এবং তাঁর সমকালীন বহু মনীষীর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এটি চুঁচুড়া হতে প্রকাশিত হত। ভূদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা এটি বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। শেষদিকে কলিকাতার ৩৩ মানিকতলা ষ্ট্রীট থেকে কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শুধু 'এডুকেশন গেজেট' নামে প্রকাশিত হত। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন ভার গ্রহণ করার পূর্বে ভূদেব চুঁচুড়া থেকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে 'শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার' নামে একটি শিক্ষামূলক মাসিক প্রবর্তন করেছিলেন। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন ভার গ্রহণের পর ১৮৬৯ এর মে মাস থেকে এই পত্রিকাটির প্রকাশ স্থগিত হয়েছিল।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মফঃস্বল থেকে বহু সাপ্তাহিক ও মাসিকের আবির্ভাব ঘটে, তবে এগুলি ছিল খুবই বিশেষত্ব বর্জিত ও স্বল্পায়ু, এর ব্যতিক্রম হিসাবে 'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকাবার্তা প্রকাশিকা, হিন্দু-হিতৈষনী ( ঢাকা ), হিন্দুরঞ্জিকা ( রাজশাহী ) ও গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ( কুমারখালি, নদীয়া ) নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকাস্থিত কয়েকজন ভদ্রলোকের উদ্যোগে ঢাকা নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত সম্ভাব শতক রচয়িতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ মার্চ ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়। সমাজ সংস্কার ব্যতীত এই পত্রটিতে কৃষক সম্প্রদায় বিশেষতঃ নীল চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনীও প্রকাশিত হত। ইংরাজ রাজকর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের ঘটনাগুলিও এতে প্রকাশিত হত। কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় চারি বৎসর কাল পত্রিকাটি সম্পাদন করেন। তাঁর পরবর্তী সম্পাদকের নাম দীননাথ সেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রটি দীর্ঘজীবী হয়েছিল। ১৩৪১-এর সরকারী রিপোর্টে ও পত্রিকাটির উল্লেখ আছে—বাংলা বাঙ্গার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নাম ছিল মুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী। ১৯১৩ থেকে এই পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৩০-এর মার্চ আপত্তিকর রচনা প্রকাশের জন্য পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সরকারী রিপোর্টে এটি মডারেট অর্থাৎ মধ্যপন্থী পত্রিকা রূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস পত্রিকাটি ১৯৪৭-এর বঙ্গবিভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিল। ঢাকা প্রকাশের কিছুদিন পর ১৮৬২-এর জুন মাসে 'ঢাকা বার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় সম্পাদকের নাম ছিল রামচন্দ্র ভৌমিক। এক বৎসর চলার পর পত্রিকাটির মৃত্যু হয়। এর পর হরিশ্চন্দ্র মিত্র (কবি) ঢাকা দর্শন নামে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ঢাকা থেকে 'হিন্দু হিতৈষনী' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকাটি হিন্দু সমাজের মুখপত্রস্বরূপ প্রায় বার বৎসর জীবিত ছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুমারখালি ( অবিভক্তবঙ্গের নদীয়া জেলা ) থেকে হরিনাথ



মজুমদার ১৮৩৩—'৯৬ ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। স্থানীয় পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ, কাঙাল হরিনাথ নামেই সমধিক খ্যাত ছিলেন। এই পত্রিকায় স্থানীয় অঞ্চলের অভাব অভিযোগগুলি প্রকাশিত হত। কিছুদিন পর পত্রিকাটির একটি পাক্ষিক এবং পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হত। মাসিক সংস্করণের প্রকাশ অনিয়মিত ছিল। পত্রিকাটি প্রথম নয়বৎসর কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত, দশম বর্ষ থেকে কুমারখালির মধুরানাথ যন্ত্র থেকে এটি প্রকাশিত হত। দরিদ্র হরিনাথ নির্ভীকতা ও সততার সঙ্গে এটি পরিচালনা করতেন। জমিদার থেকে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজকর্মচারীদের অনাচার ও অত্যাচারের ঘটনাগুলি সবই এতে প্রকাশিত। ক্রমশঃ তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে থাকে এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্য ঋণও বাড়তে থাকে। ১২৭৭ থেকে '৮৬ সাল অর্থাৎ নয় বৎসর চলার পর সাপ্তাহিক গ্রামবার্তার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৯ সালে মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশ রহিত করে পুনরায় সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা প্রচারিত হতে থাকে, এই সময়ে কাঙাল হরিনাথের সাহিত্য শিষ্য জলধর সেন ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এর ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১২৯১ সাল অবধি ঐটি প্রকাশিত হয়েছিল। হরিনাথের বার্দ্ধক্য ও ঋণের বোঝাই এই অবলুপ্তির কারণ। দীর্ঘ এগুন বৎসর কাল দূর পল্লীগ্রামের এক পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ শুদ্ধ মাত্র স্থানীয় মানুষদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি চালিয়ে গিয়েছেন। এরজন্য বহু অত্যাচার ও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। নানাদিক থেকে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রকাশিকার বহু নবীন লেখক উত্তরকালে যশস্বী হয়েছিলেন, এর মধ্যে জলধর সেন ( ১৮৬১-১৯৩৯ ) ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ( ১৮৬১-১৯৩০ ) এর নাম উল্লেখযোগ্য ( দ্র. বাঙ্গলা সাময়িকপত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৪৬ ( পৃঃ ২৮৫-২৯২ )।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার অভ্যুদয় হয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বঙ্গদেশের নানাস্থানে নৈষ্ঠিক হিন্দুগণও কিছু সভা-সমিতি সংগঠন করেন এরূপ অনেক সংগঠন থেকে কিছু 'মুখপত্র' ও প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে রাজশাহী-বোয়ালিয়া থেকে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিকরূপে ১২৭২ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীনাথসিংহ রায়ের সম্পাদনায় বোয়ালিয়া ধর্মসভার মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। ১২৭৫ সালের বৈশাখ ( ১৮৬৮ এপ্রিল ) থেকে হিন্দুরঞ্জিকা সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

১৩৪১-এর ২১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে জানা যায় যে দীর্ঘ ৬৫ বৎসর ধরে হিন্দুরঞ্জিকা প্রচারিত হয়ে আসছে, বোয়ালিয়ার ধর্মসভার কর্তৃপক্ষগণই এটি চালিয়ে থাকেন। ধর্মসভা গৃহই হিন্দুরঞ্জিকার কার্যালয় এটি নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় নির্মাণ করিয়ে দেন। দ্র: বাংলা সাময়িকপত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৪৬, পৃঃ ৩২০ )। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দেও পত্রিকাটি জীবিত ছিল, সম্পাদকের নাম ডাঃ বিজেশগোবিন্দ সেন। আমাদের বিশ্বাস এই ধর্মীয় পত্রিকাটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৮০৭ বর্ষকাল ধরে জীবিত ছিল।

১২৫৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস থেকে ( ১৮৫১ ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ( ১৮২২-'৯১ ) সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাংলা ভাষার সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছিল। তাঁর কার্যভার ত্যাগের পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ এটির সম্পাদন ভার নিয়েছিলেন কিন্তু এটি দীর্ঘকাল

চালাতে পারেন নি ৎম পর্বের ৮টি মাত্র সংখ্যা তিনি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এই অভাব পূরণার্থে ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'রহস্য সম্পর্ক' নামে একটি অষ্টরূপ সচিত্র মাসিক পত্র প্রবর্তিত হয় এবং স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রই এটির সম্পাদন ভার গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে এটির সম্পাদনার ব্রতী হন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ছয় বৎসর কালে ৬৬টি সংখ্যা সম্পাদন করে তিনি পদত্যাগ করেন। অতঃপর প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদনায় এই পত্রের ৭ম পর্ব প্রকাশিত হয়। ১২৮০ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত রহস্য সম্পর্কের নব পর্যায়বলী প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় ( ১৮৭৪ খৃঃ )।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ ১২৭০ ) 'অবোধবন্ধু' নামে একটি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এটি ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা রূপে পুনঃ প্রকাশিত হয় ( ১২৭৩ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন )। এই পত্রের স্বত্বাধিকারীও প্রথম সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ( ১৮৩৫-'৯৪ ) প্রথমাবধিই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৭৮ বঙ্গাব্দ থেকে বিহারীলাল এর সম্পাদক স্বত্বাধিকারী হন, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এটি ১২৭৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস থেকে বন্ধ হয়ে যায়। বিহারীলালের রচনা ব্যতীত এই পত্রিকায় আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ( ১৮৪০-১৩২ ) বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'পল-বর্জিনিয়া' নামক ফরাসী উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদ তিনি 'পৌল বর্জিনী' নামে 'অবোধবন্ধু'-তে প্রকাশ করেন। শিশু রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বাল্যকালে তাঁর অবোধবন্ধু পাঠের সুখ-স্মৃতির উল্লেখ করেছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মবন্ধু' সভা নামে একটি সংগঠনের সূত্রে পাঠ হয়। সমাজ সংস্কার বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এর উদ্দেশ্য ছিল। কেশব শিষ্যগণ বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বামাবোধিনী সভা নামে একটি পৃথক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্তঃপুর বাসিনী মহিলাগণ যাঁরা যথাকালে সুশিক্ষিতা হতে পারেন নি, তাঁদের মঙ্গলের জন্য ১২৭০ সালের মাঘ মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' বামাবোধিনী সভার কার্যালয়ে ১৬, রঘুনাথ চাটুজ্যের স্ট্রীট সিমলা পল্লী কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম থেকে এতে ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান, গৃহ-চিকিৎসা, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও কিছু কিছু মনোরঞ্জক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হত। এতে অন্তঃ পুরিকাদের রচনা পাঠাতে উৎসাহিত করা হত, এবং এঁদের রচনাও প্রকাশিত হত। উৎকৃষ্ট লেখিকাকে পুরস্কৃত করারও ব্যবস্থা ছিল। এই পত্রিকার শিরোদেশে বঙ্গান্তরবাদ সহ লেখা থাকত' কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ', কন্যাকে পালন করিবেন ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেন। ১৮৭৩ থেকে মৃত্যুকাল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ৪১ বৎসর ধরে মজিলপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্ত ( ১৮৪০-১৯০৭ ) এর সম্পাদক ছিলেন। সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি আমৃত্যু এর অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর সুকুমার দত্ত, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী উষা প্রভা দত্ত, সন্তোষকুমার দত্ত, ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, আনন্দকুমার দত্ত প্রভৃতি এটি সম্পাদন করেন। ১২২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। প্রায় ষষ্ঠী বর্ষকাল পরমায়ু থেকে প্রমাণিত হয় যে এটি একটি সমাদৃত পত্রিকা ছিল। আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সুশিক্ষা



বিস্তারে এই পত্রিকাটির দান অনস্বীকার্য। বহু কৃতী লেখকের রচনাও বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১২৭৬ খৃঃ ঢাকা থেকে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় অবলা বান্ধব প্রকাশ করেন। ১৮৭০ থেকে এটি পাক্ষিক আকারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি স্বনামধন্য ছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র রূপে ধর্মতত্ত্ব নামে একটি মাসিক পত্র ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। কয়েক বর্ষ পর এটি পাক্ষিকে পরিণত হয়। পত্রটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও শতাধিক বর্ষ কাল জীবিত ছিল। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন গৌরগোবিন্দ রায়। ১৯৩২-এর সরকারী রিপোর্টে লিখিত আছে যে ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে অবস্থিত নববিধান প্রেসে মুদ্রিত এই পাক্ষিক পত্রিকাটির প্রকাশক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, প্রকাশক ভবনাথ মুখার্জি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ১২৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ ( ১৮৭০ ) সুলভ সমাচার নামে একটি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। সংবাদ ব্যতীত এতে জীবনচরিত, দেশবিদেশের ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক নানা তথ্য থাকত। মূল্য ছিল মাত্র ১ পয়সা, এত স্বল্পমূল্যে এত উচ্চ-শ্রেণীর পত্রিকা আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি। এই পত্রিকাটি বঙ্গভাষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিল। কেশবচন্দ্র এই পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম সম্পাদক রূপে ঘোষিত হত। ষোল বৎসর চলার পর এটি সুলভসমাচার ও কুশদহ নামে ১৮৮৬ এর আগষ্ট মাস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এর পরেও বেশ কিছু কাল এই পত্রিকাটি যুগ্ম নামে বেঁচেছিল। এর সম্পাদক পদ মাসে বদল হত, প্রথম সম্পাদক উমানাথ গুপ্ত, সহকারী অমরনাথ গুপ্ত।

বেশ কিছুকাল পর কেশবচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা ( খুল্লতাত পুত্র ) নরেন্দ্রনাথ সেন ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ নবপর্যায় সুলভ সমাচার দৈনিকরূপে প্রকাশ করেন তবে এটি সরকারী আনুকূল্য পুষ্ট হওয়ার জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি, মাত্র ২৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। জলধর সেন এই দৈনিকের সহ সম্পাদক ছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর এই পত্রিকাটি কিছুদিন পর কালীপ্রসন্ন সিং গঠিত একটি ট্রাস্টের হাতে চলে যায়, এই ট্রাস্টের কাছ থেকে কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল সুকৌশলে এটি হস্তগত করে নেন। এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফীল্ড ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু প্যাট্রিয়টের সঙ্গে যুক্ত হয়। কৃষ্ণদাস পাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বেতনভুক্ত সহকারী সম্পাদক ছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন জমিদার। কৃষ্ণদাস হিন্দু-প্যাট্রিয়টের দায়িত্ব নিয়ে জমিদারি স্বার্থরক্ষার দিকেই বেশী মন দেন, অবশ্য পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন ভাবেই হিন্দু প্যাট্রিয়েট চালাতেন। শাসককুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে না গিয়েও তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যাট্রিয়ট কাগজে ভারতবাসীর জন্য Home Rule বা স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানিয়েছিলেন ( The News Paper in India p. 38, calcutta 1952 Hemandraprasad Ghose )। কৃষ্ণদাস পাল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই পর্যন্ত পত্রিকাটি আমৃত্যু যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়েছিলেন। যাই হোক, হরিশের মৃত্যুর পর দেশের ইংরাজী শিক্ষিত মানুষেরা প্যাট্রিয়টের মতই একটি স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন আর সেই

অভাব পূরণ করতে এগিয়ে আসেন এক তরুণ সুশিক্ষিত যুবক মনোমোহন ঘোষ ( ১৮৪৪-'৯৬ )। এঁর পিতার কর্মস্থল ছিল কৃষ্ণনগর। ছাত্রাবস্থাতেই ইনি হিন্দু-প্যাট্রিয়টের স্বনামধন্য সংবাদদাতারূপে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করার সময় ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আস্থাভাজন হন, কেশবচন্দ্র সেন এই উৎসাহী স্বদেশ-প্রেমিক যুবককে বিশেষ প্রীতিরচক্ষে দেখতেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়, মনোমোহন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একটি পাক্ষিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করেন, এটি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রেস থেকে ছাপার ব্যবস্থা হয় সম্ভবত কেশব এঁর আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ নয়। কেশবের খুল্লতাত পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন, কিশোরীচাঁদের ইণ্ডিয়ান মীরর এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১ আগষ্ট 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর কেশবের তত্ত্বাবধানে নরেন্দ্রনাথ এর সম্পাদকের পদলাভ করেন। সর্বশ্রেণীর জনগণের স্বার্থে দেশের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাই ইণ্ডিয়ান মিরারের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের অপ্রিয়ভাজন হন, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে 'মিরর' পত্রের স্বত্বাধিকার দাবী করা হলেও কেশব একক এর স্বত্বাধিকারী প্রমাণিত হন। অতঃপর কেশব অন্য মুদ্রাযন্ত্র থেকে মিরর প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ থেকে কেশব নিজেই এর সমস্ত ব্যয় ভার বহন করতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে কেশবের তত্ত্বাবধানে মিররের একটি রবিবাসরীয় সংস্করণ প্রকাশিত হত, কেশব ভ্রাতা সুপণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী সেন এটি সম্পাদন করতেন। কিছুদিন পর ১৮৬৯ থেকে নরেন্দ্রনাথ মিররকে একটি সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। নরেন্দ্রের সম্পাদনা-কালের মধ্যে কিছুদিন স্বয়ং এটি সম্পাদন করেন, যেমনঃ প্রতাপ মজুমদার। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকে কেশবচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী দৈনিকে পরিণত করা হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবাসী পরিচালিত প্রথম দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র—'ইণ্ডিয়ান মিরর'। এই গৌরব কেশবচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কেশবচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে ইণ্ডিয়ান মিররের সর্বস্বত্ব দান করেন। নরেন্দ্রনাথ বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এটি যুগ্মভাবে সম্পাদন ও প্রকাশ করে যান ( ১. ৭. ১৯১১ )। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত এই পত্রিকাটি সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় সরকার সমর্থক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল। পেশায় এটর্নি নরেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ প্রচারে সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাত্র দুজন বাঙালী প্রতিনিধি গিয়েছিলেন, একজন নববিভাকর সম্পাদক গিরিজা মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। নির্ভীকভাবে সরকারের সমালোচনা করার জন্য গভর্নর জেনারেল ও তাঁর অধস্তন কর্মচারীগণ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সমাজ সংস্কার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি তৎপর ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও বয়কট আন্দোলন সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। সরকারী সাহায্যে 'হুলভ-সমাচার



প্রকাশে যুক্ত হওয়া তাঁর জীবনের একমাত্র বিচ্যুতি। নরেন্দ্রনাথ রাজকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র রাজকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহনের মধ্যম পুত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২রা মে 'বেঙ্গলী' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ বাংলার তথা ভারতীয় সংবাদ জগতের একটি বিশেষ ঘটনা। এই পত্রিকার প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাস ভাজন ব্রাহ্মাচর্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর বেচারাম তাঁহাকে গায়ত্রী শব্দের ব্যাখ্যা শুনিয়ে গায়ত্রী জপের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বেচারাম রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদও পড়িয়েছিলেন। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেঙ্গলী ৮, কৃষ্ণদাস সিংহ লেন ( সিমলাপল্লী ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। এই পত্রটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন স্বনামধন্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ( ১৮৪৪—১৯০৬ )। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি অষ্টাদশ বর্ষীয় উমেশচন্দ্র তৎকালে এটর্নি অফিসে শিক্ষানবিশী করতেন। ১৮৬৪ খৃঃ তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং বার-য়্যাটল ল'তে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ে বিপুল সাফল্য লাভ করেন। হরিশ্চন্দ্রের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও সহোদর তুল্য স্নেহভাজন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( ১৮২৯—'৬৯ ) এই নব প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের মতই স্বদেশ বৎসল ও স্বলেখক ছিলেন। কৃষ্ণদাসের সম্পাদনায় প্রথম দিকে এটি ত্রুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিশনের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল, হরিশ এসোসিশনের একজন শুস্ত বিশেষ ছিলেন কিন্তু এটিকে কখনও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত করেন নি। হরিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লোক-কল্যাণ ও স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিরিশ বেঙ্গলীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। অতি যোগ্যতার সঙ্গে আমৃত্যু তিনি এই পত্রটি সম্পাদনা করেন। হরিশের বসত বাড়ীটি মাত্র কয়েক শত টাকার জন্য 'ক্রোক্' হয়ে নীলামে বিক্রি হওয়ার উপক্রম হলে গিরিশ 'বেঙ্গলীর' পত্রের মারফৎ জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন করে যে অর্থ পান তার দ্বারা বাড়ীটি ক্রোক্ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। কালীপ্রসন্ন সিং ১৮০ টাকা বেঙ্গলীর এই ফাণ্ডে দিয়েছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে গিরিশ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করার পর বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে এটি চালাতে চেষ্টা করেন। নামমাত্র মূল্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি কিনে নেন। 'বেঙ্গলী' পত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হওয়াতে সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। কলুটোলার কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত দশ বৎসরের জন্য একটি চুক্তি করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের অংশীদার করে নিয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 'বেঙ্গলী' কাগজটিকে দৈনিকে পরিণত করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পর সুরেন্দ্রনাথ এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। ১৯১৮ পর্যন্ত 'বেঙ্গলী' সুরেন্দ্রনাথের হাতে ছিল। স্বরাজ সাধনায় বেঙ্গলী কাগজের দান অনস্বীকার্য, সুরেন্দ্রনাথ ও 'বেঙ্গলী' উভয়েই পরস্পরের গৌরব বর্দ্ধন করেছিল। 'বেঙ্গলীর পরবর্তী ইতিহাস যথাসময়ে আলোচিত হবে।

'ন্যাশনেল' নবগোপাল নাম খ্যাত, 'ন্যাশন্যাল সোসাইটি' 'ন্যাশন্যাল স্কুল', হিন্দু-মেলা বা চৈত্র মেলার' প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালী যুবকদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য বহু প্রতিষ্ঠানের সংগঠক দুর্দম্য জাতীয়তাবাদী নবগোপাল মিত্র ( ১৮৪০—'৯৪ ) তাঁর নিজস্ব ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য ১৮৬৫

খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ন্যাশনেল পেপার' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্র প্রবর্তন করেন। নবগোপাল মিত্র হিন্দু স্কুলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গুণেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর এই তিনজনই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। সত্যেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের সহিত সখ্যতা সূত্রে তিনি মহর্ষির অতিশয় স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্মকর্তা হন। কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও শঙ্কর ঘোষ লেনের সংযোগস্থলে তাঁর পৈত্রিক আবাস ছিল। নিজস্ব ধারায় দেশের কাজ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি সর্বস্বান্ত হন। তাঁর নিজস্ব জাতীয়তাবাদ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভাব ধারা প্রচার ছিল ন্যাশনেল পেপার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, প্রতি বুধবার এটি প্রকাশিত হত। প্রথম দিকে ন্যাশনেল পেপার' প্রতিষ্ঠায় তিনি দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস থেকেই এটি ছাপা হত। এই সময় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির বিচ্ছেদ ঘটায়, নবগোপাল মহর্ষির অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে যান। দুই বৎসর পর 'ন্যাশনল পেপার' এর জন্য নবগোপাল মহর্ষির উপর আর নির্ভর করেন নি। তিনি একটি প্রেস কিনে—নাম দেন 'ন্যাশনেল প্রেস'। ১৮৬' খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে 'ন্যাশনেল পেপার' ন্যাশনেল প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। নিজস্ব প্রেস থাকায় এই পত্রটি বেশ কিছু কাল চলেছিল, তবে এটি কতদিন চলেছিল তা জানা যায় না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেও এই পত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়। দেশবাসীকে দৈহিক দিক থেকে শক্তিশালী করে ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে নবগোপালের এই চিন্তা তৎকালে বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের চিন্তার অতীত ছিল, তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধ এবং বাঙালীত্বের গৌরব তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও উপহাসের বিষয় ছিল। নবগোপাল জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর দেশবাসীর কাছ থেকে কোন সম্মান পান নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম শালাগুলি থেকেই অনুশীলন সমিতির মত বিপ্লবী সংস্থাগুলির জন্ম হয়। উত্তরকালের বহু স্বনামধন্য নেতা এই উন্মাদ দেশপ্রেমীর কাছ থেকেই স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা পেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নবগোপাল প্রতিষ্ঠিত একটি আখড়ায় গিয়ে কুস্তি লড়তে শিখে ছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ( বৈশাখ ১২৭৯ ) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত মাসিক বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সমাগত রাজবন্দ্বত ং ধ্বনি 'অথবা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় লুট করিয়া লইল।' বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ থেকে ১২৮৩ অর্থাৎ চার বৎসরকাল এটি সম্পাদন করেন। ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গদর্শন ৎটি খণ্ড সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে।

নাট্যকার ও কবি মনেমোহন বসুর ( ১৮৩১—১৯১২ ) সম্পাদনায় মধ্যস্থ নামে একটি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক পত্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ২৭ সংখ্যা থেকে এটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়। ১২৮২ বঙ্গাব্দে আশ্বিন পর্যন্ত এটি মাসিক রূপে জীবিত ছিল। এটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা রূপে গণ্য হয়েছিল।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে হালিশহর পত্রিকা মাসিকরূপে প্রবর্তিত হয়, ২য় বর্ষে এটি পাক্ষিক ও তৃতীয় বর্ষে এটি সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কলকাতা থেকেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হতে থাকে।



ইংরাজী অংশটুকু সম্পাদন করতেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লেখক কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৮৪৮—১৯১৮ )। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আপত্তিকর মন্তব্য ও সংবাদ প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সতর্ক করে দেওয়া হয়। বঙ্গভাষায় প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার পত্রিকার মত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির সমালোচনায় সরকার এই সময় বিব্রত বোধ করেছিল। প্রচলিত দণ্ডবিধি আইন ( ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে ) প্রয়োগে এই সব সমালোচনা স্তব্ধ করা যাবে না ভেবে—এই সময় থেকেই দেশীয় সংবাদপত্র দমনের জন্য সরকারী মহলে ভাবনা-চিন্তা সুরু হয়, এ সময় বাংলার ছোটলাট ছিলেন সার জর্জ ক্যাম্বেল। বাংলার ছোটলাটের মতই অন্য প্রদেশের ছোটলাটরাও এই সম্পর্কে ভারত সরকার তথা গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি সুরু করেন, সেখান থেকে লণ্ডনে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের সঙ্গেও আলোচনা সুরু হয়—দীর্ঘকাল ধরে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলেছিল। লর্ড নর্থব্রুকের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন। ১৮৭৮ ১৪ই মার্চ শুধুমাত্র দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমনের জন্য তিনি 'নবম অ্যাক্ট' জারী করেন সোমপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় আর অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরাজী সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

ইংরাজ শাসন বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরাও ভারতের নানা স্থানে জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই বাঙালীরা প্রবাসে ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, ফার্সী, ও হিন্দী সংবাদপত্র প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। এর পূর্বাভাস ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। কাশী থেকে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১ জুন কাশীদাস মিত্র কাশীবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেই এটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়, কিছুদিন বন্ধ থাকার পর এটি পুনঃ প্রবর্তিত হয়, এটি অন্ততঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। পর বৎসর কাশীদাস আকতাবি হিন্দ নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিকও প্রবর্তন করেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বারাণসী থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'ষ্টার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করতেন। ঐ সময়েই দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বারাণসী থেকে 'মাদারল্যাণ্ড' নামক একটি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। সিপাহী যুদ্ধের পর 'ইয়ং বেঙ্গল' খ্যাত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তথনকার নর্থওয়েষ্টার্ন প্রাভিন্সের ( বর্তমান উত্তর প্রদেশ ) শঙ্করপুর নামক স্থানের তালুকদারি লাভ করেন ; স্থায়ীভাবে ঐ প্রদেশেই থেকে যান এবং ঐ প্রদেশের উন্নতির জন্য বিবিধ সৎকর্মের প্রবর্তন করেন। তৎকালে প্রচলিত লক্ষ্ণৌ টাইমস কাগজের স্বত্ব ও প্রেসটি তিনি কিনে নেন। শেষ জীবনে হরিশের সহকারী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮০৯-'৯৪ ) অল্প কিছুদিন হিন্দু প্যাট্রিয়ট সম্পাদন করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'তিনি মুখার্জিস ম্যাগাজিন' নামে একটি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। এটি তিনি চালাতে পারেন নি। ইতিমধ্যে পণ্ডিত ও স্থূলবক্তৃপে তাঁর সুনাম রটেছিল। দক্ষিণারঞ্জনের আহ্বানে, তিনি লক্ষ্ণৌ যান এবং লক্ষ্ণৌ টাইমস প্রেস থেকে সমাচার হিন্দুস্থানী নামে একটি ইংরাজী মাসিকপত্র সম্পাদনের ভার পান। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এর ৬ জানুয়ারী এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। কলকাতার প্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী বংশের সম্মান স্থপণ্ডিত রাজকুমার সর্বাধিকারী ( ১৮৩১-৯৪ ) সাপ্তাহিক লক্ষ্ণৌ টাইমসের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শম্ভুচন্দ্র লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর রাজকুমার এই সঙ্গে জুন মাস

থেকে সমাচার হিন্দুস্থানী মাসিকটিও সম্পাদন করতেন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত রাজকুমার দক্ষিণা-রঞ্জন প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত ও আইনের অধ্যাপনা করতেন। ক্যানিং কলেজটি পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। 'লক্ষ্ণৌ টাইমস্' সাপ্তাহিকটি রাজকুমারের সম্পাদনায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় সরকারী কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করা হত। নীলকমল মিত্র ও প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় ১৮৬৬ খৃঃ 'রিফ্লেকটর' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র এলাহাবাদে প্রকাশিত হয়, এটি বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ মাঝামাঝি সময়ে ( বৈশাখ ১২৭৫ ) মধুসূদন মৈত্র 'প্রয়োগ দূত' নামে একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। তিন বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭১ থেকে এটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ পর এলাহাবাদ বা প্রয়াগ থেকে বাঙালীদের চেষ্টায় বহু ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী পত্র পত্রিকা পরিচালিত হয়েছিল।

লাহোর ওরিয়েন্টেল কলেজের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার নবীনচন্দ্র রায় ( ১৮৩৮-'৯০ ) ১৮৬৫ খ্রীঃ 'জ্ঞান-প্রদায়িনী' নামে একটি হিন্দু-উর্দু দ্বিভাষিক পত্র কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। কিছুদিন পর এটি শুধু হিন্দীতে প্রকাশিত হত। ১৮৮৫ পর্যন্ত এটি প্রচলিত ছিল। নবীনচন্দ্র কিছুকাল হিন্দীভাষায় 'হিন্দু বান্ধব', এবং উর্দুভাষায় 'বিরাদরে হিন্দ্' ও 'রিফর্মর' নামক সাময়িক পত্র পরিচালিত করে ছিলেন। পাঞ্জাব প্রদেশে উর্দু ও হিন্দী ভাষায় খুব ভাল পত্র প্রকাশে তাঁর আগে কেউ অগ্রসর হন নি। পাঞ্জাবের ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিই ছিল তাঁর হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে এঁর কন্যা হেমন্তকুমারী চৌধুরী হিন্দী ভাষার সর্বপ্রথম মহিলাদের সুগৃহিনী নামেও একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করতেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। লাহোর প্রবাসী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ( মৃত্যু ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ) লাহোর থেকে 'হিমালয় গেজেট' ও 'পিওরিটি সারভেন্ট' নামে দুটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করতেন। ১৮৮১ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া কর্তৃক ট্রিবিউন পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে বহু বাঙালী সাংবাদিক এর সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন বিষয়টি পরে আলোচিত হবে। লাহোর ওরিয়েন্টল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হৃষীকেশ শাস্ত্রী ( ১৮৫০-১৯১৩ ) 'বিদ্যোদয়' নামে একটি সংস্কৃত মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর লাহোর বাসের পর তিনি স্বগ্রাম ভট্টপল্লীতে ফিরে আসেন এবং কলকাতা সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এর পর থেকে এই সংস্কৃত মাসিক পত্রিকাটি তিনি বহু বর্ষ যাবৎ কলকাতা থেকেই প্রকাশ করতেন। ওড়িশার কটক জেলার একটি গ্রামে এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারে গৌরীশঙ্কর রায়ের জন্ম হয় ( ১৮৩৮-১৯১৭ ) হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করে ইনি কটকের একটি সরকারী আপিসে কাজ করতেন। কটকে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি সর্বপ্রথম উড়িয়া ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'উৎকল দীপিকা' প্রবর্তন করেন। ওড়িশা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনাই এর বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্তমান উড়িয়া ভাষার গদ্যের গতিশীলতা এই পত্রটির সৃষ্টি। ওড়িষাভাষীরা বঙ্গ সন্তান গৌরীশঙ্করকে উড়িয়া সাংবাদিকতার জনক বলে গণ্য করেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে তিনি এই পত্রিকাটি পরিচালন করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ



ঔপন্যাসিক ও পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪৭-১৯১৯ ) ১৮৬৮ থেকে '৭০ পর্যন্ত কটকে কর্মোপলক্ষ্যে বাস করতেন। উড়িয়া ভাষা শিখে তিনি কটক থেকে 'উৎকল-শুভকরী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭-৮৭ ) কর্মোপলক্ষে বালেশ্বরে থাকার সময় 'উৎকল-দর্পণ' নামে উড়িয়া ভাষায় একটি মাসিক পত্র প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ থেকে এটি বৈকুণ্ঠনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত হত। ১৮৬৪ খ্রীঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কটক থেকে 'উৎকল হিতৈষনী' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালেও বহু বাঙালী ওড়িয়া ইংরাজী ভাষায় পত্র-পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করেছিলেন।

১৮৭২ খ্রীঃ যদুনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় আসাম-মিহির নামে সাপ্তাহিক পত্রটি ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয় নি। পরবর্তীকালে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অথও আসামে বাঙালীদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিষয়টি পরে আলোচিত হবে।

একটি সরকারী সমীক্ষা থেকে জানা যায় সিপাহী বিদ্রোহের পর এক যুগ ধরে অর্থাৎ ১৮৫৮ থেকে '৭০ পর্যন্ত তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে বাংলা ভাড়ায় ৮৭টি বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রচারিত ছিল। এর মধ্যে একটি ত্রৈমাসিক, ৫০টি মাসিক, ৭টি পাক্ষিক, ২২টি সাপ্তাহিক, একটি ত্রি সাপ্তাহিক একটি দৈনিকপত্র ছিল। এতগুলি বাংলা কাগজের প্রকাশ তাতে বিরুদ্ধ জনমতের প্রতিফলন সরকার পক্ষকে বিচলিত করেছিল।

# মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর

## শিশির ভট্টাচার্য

সবচেয়ে কম কথায় বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি যিনি সবচেয়ে সফলভাবে আঁকতে পেরেছেন তিনি হলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়, তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।" এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলবার প্রয়োজন হয় না বিদ্যাসাগর চরিত্র বোঝাতে গিয়ে। আগুনই বটে। এ চরিত্রের আর একটি মাত্র উদাহরণ আছে এদেশের ইতিহাসে সেও তাঁরই সমসাময়িক কালে। তিনি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের উজ্জ্বলতা এতই আকর্ষণীয় ছিল যে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

কোনদিন যদি বাঙালী পৃথিবীর ইতিহাসে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেদিন যদি তার উত্তর পুরুষেরা জাতীয় স্মৃতিকাগৃহের অতীত প্রস্তুতত্ত্বকে ইতিহাসের বীক্ষণাগারে খুঁজে নিয়ে আসে সেদিন তারা দেখতে পাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামই সেখানে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে তার পূর্বপুরুষদের পরিচয়ে।

এখন প্রশ্ন জাগে এই বিদ্যাসাগর কে? কেমন ছিল তাঁর মানবসত্তা? এর উত্তরে বলা যায় বিদ্যাসাগর কোন একজন মানুষের নাম নয়। বিদ্যাসাগর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। হ্যাঁ সত্যিই বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান করতে বসলে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়—একজন মানুষের কর্মজীবন এত বিপুলভাবে বিস্তৃত কি করে হতে পারে? সমাজের এমন কোন অংশ বা বিভাগ আছে যেখানে তাঁর বরাভয় করস্পর্শের অমৃত কণা লাগে নি।

সত্যিই মানুষ বিদ্যাসাগরের সঠিক মূল্যায়ণ করাতো দূরের কথা তাঁর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে কোন তথ্যানুসন্ধানই এ পর্যন্ত হয় নি। কে করবে? কারা করবে? বাঙালীর মেরুদণ্ডে জাতীয়তার কোন বোধই আজও জাগে নি।

যাই হোক আসল কথা হল বিদ্যাসাগর তাঁর সঠিক সময়ের অনেক আগেই জন্মে গেছিলেন। আর তাই আমরা কেউ তাঁকে বুঝে উঠতেই পারি নি। তাঁর কর্মকৃতির হিসেব নিকেশ করা তো দূরের কথা! বিদ্যাসাগরও তাঁর সুবিশাল কর্মকৃতি এমনই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য ও ঘটনাই প্রায় কিম্বদন্তীরূপে পরিচিত হয়ে আছে। যদিও তার সমস্তটুকুই হয়ত তথ্যও ইতিহাস নির্ভর নয়। আজ যদি প্রশ্ন করা যায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জনমানসের এই আবেগও অতিমানবত্ব আরোপের কারণ কি? তবে অতি সহজেই তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ আর কিছু নয়। কারণ কেবলমাত্র তাঁর মানব প্রেম। বিদ্যাসাগরের ধারণায় "মানুষের ধর্ম"ই হচ্ছে সকল মানুষের পক্ষে একমাত্র পালনীয় ধর্ম। এ ছাড়া আর কোন ধর্ম তিনি স্বীকার করেন নি কখনো। কিন্তু তাঁর এই অপ্রমেয় মানবপ্রীতির উৎসটা কোথায় যদি খুঁজতে চাই তবে আমাদের আরও কিছু পেছনে হাটতে হবে। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের বাংলাদেশে।



এইখানে আমরা যদি সে যুগের সমসাময়িক কালের ছবিটার ওপর একটু দৃষ্টি দিতে চাই তাহলে দেখি সেটা ছিল এমন একটা অন্ধকারের যুগ যেখানে সমাজে ব্যক্তিমানসের কোন চিহ্নই ফুটে ওঠে নি। মাঝে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে সমস্ত হিন্দুসমাজকে ধ্বংস ও ধর্মান্তকরণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তারপরের তিনশ বছর ধরে আর কেউ এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। ফলে যা হবার তাই। খোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি খোড়। দর্শন বা স্মৃতির স্মৃতিচারণ ছাড়া আর নতুন কোন আবিষ্কার হল না। নতুন কোন দিগন্ত খুলল না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন বিদেশী বণিকেরা এদেশে পদার্পণ করে। ধীরে ধীরে রাজশক্তি দখল করে তারা। হাজার রকম স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে তারাই প্রথম এদেশের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়। বহির্জগতের খোলা আলো হাওয়া এদেশের অন্ধকার সমাজের আনাচে কানাচে আলোড়ন তোলে। কিছু মানুষ দেশের অচলায়তন স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সেই আলোর আহ্বানে সাড়া দিল।

মোটামুটি এই সময়েই—অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। আচার ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতার হাত থেকে সমাজ ও ধর্মকে উদ্ধার করে প্রাচীন বৈদিক ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগে তিনি আন্দোলন সুরু করেছেন। দেশের মানুষ ও হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবনের এই কাজে রামমোহনকে একদিকে যেমন বিদ্রোহ করতে হয়েছে ধর্মান্ধ গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর একদিকে লড়াই লেগেছে তাঁর খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে।

রাজধানী কলকাতা শহর থেকে বহু দূরে এক গণ্ডগ্রামে অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মে ঈশ্বরচন্দ্র এসব পরিবর্তনের সুদূরতম আভাসও পেতেন না যদিনা দারিদ্রের কঠিন নিষ্পেষণে তাঁর পিতৃদেব ঠাকুরদাসকে বালক বয়সেই পঞ্চাশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ভাতের সন্ধানে শহরের পথে পথে অনাহারে অর্ধাহারে ঘুরে বেড়াতে হত। যদি না মাত্র ন বছর বয়সে পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে তাঁকেও কলকাতায় এসে পৌছুতে হত। মাসিক দু টাকা মাত্র মাইনায় নিযুক্তির খবর পেয়ে ঠাকুরদাসের দেশের বাড়ীতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছিল সেদিন। ১৮২৯ খ্রীঃ ১লা জুন' বছর বয়সেই ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। অবর্ণনীয় দারিদ্রের জন্যে তিনি নিজে শিক্ষার যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, অসাধারণ মেধাবী পুত্রের শিক্ষার সর্বরকম বন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি তারই প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। আন্তরিক অধ্যাবসায়ে তিনি নিজে সংস্কৃত ও কাজ চালাবার মত ইংরেজীও শিখে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান প্রধান গুণের অঙ্কুর এখানেই পোতা হয়ে গেছিল। তাঁর পড়ার খরচের জন্যে ঠাকুরদাসকে বিব্রত হতে হয়নি। বৃত্তির টাকায়ই তিনি পাঠক্রমের শেষ ধারা অবধি এগিয়ে গেছেন। পড়েছেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজীভাষা, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় দর্শন, পুরাণ, হিন্দু আইন ও জ্যোতিষশাস্ত্র। ১৮৪১ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করে তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ডিরোজিওর "ইয়ং বেঙ্গল" দলের অনেকেই তাঁর বন্ধু ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকজনের অনেকের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল দলের ইংরেজীয়ানা, অকারণ ভাবালুতা, দেশ, সমাজ ও ধর্মের প্রতি অকারণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঈশ্বরচন্দ্রের চারপাশ দিয়ে বয়ে গেলেও

তাঁর মনকে প্রভাবিত করেনি একটুও। বরং গ্রাম বাংলার শোচনীয় দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা, ধর্মান্ধতা ও দেশাচারের অত্যাচার এবং সবার উপর নারীজাতির অনাদর ও অকারণ নিগ্রহ তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। দিনের পর দিন কাঁদিয়েছে। তিনি স্থির নিশ্চয়ে পৌঁছেছেন, অশিক্ষা ও কুশিক্ষাই এর একমাত্র কারণ। সমাজের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে হলে সর্বপ্রথমেই চাই আধুনিক শিক্ষার প্রসার আর তা চাই উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন, পুরুষনারী নির্বিশেষে। দেশাচারের বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োজন শাস্ত্রের ভেতর থেকেই যুক্তির প্রমাণ এবং তার পরে চাই আইনের সাহায্য।

ফলতঃ যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র নিজে উপযুক্ত ও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছেন তখনই ভবিষ্যতের কর্মপন্থার ছক তাঁর আঁকা হয়ে গেছে এবং সেভাবেই একের পর এক ধাপ তিনি এগিয়ে গেছেন। আর তাঁর প্রতিটি ধাপই ছিল অঙ্কের হিসেবে নির্ভুল।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ছিলেন অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান। তাই দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, অপমান ও অসহায়তা তাঁর জলন্ত অভিজ্ঞতায় আঁকা ছিল। যুক্তি ও বিচারবোধ তাঁর সহজাত ছিল। তাই সমস্তরকম রক্ষণশীলতা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেছেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর করেছেন। নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। শ্রমজীবিদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয়ও তিনিই প্রথম খুলেছেন। বাংলা বর্ণশিক্ষা ও ব্যাকরণ সংস্কার তাঁর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন এবং নিজে প্রেস কিনে নিয়ে বইছাপার বন্দোবস্ত করেছেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন তাঁর নির্ভীক মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে।

নারীমুক্তির জনকও বিদ্যাসাগর, তিনি কেবল বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ করতে চেষ্টাই করেন নি বিধবা বিবাহের প্রচলন ও প্রসার করতে গিয়ে তাঁকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়। তাঁর একমাত্র পুত্রের বিবাহ তিনি বিধবার সঙ্গে দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সমস্তরকম দুর্বলতা, নির্বীর্যতা ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদে দৃপ্ত পৌরুষ।

ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তাধারায় জীবমাত্রেই শিবজ্ঞান ছিল। তাই হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, মেথর ধাঙ্গর এসবের কোন পার্থক্য তিনি করেন নি। আর্ত, শরণাগতের ডাকে সর্বত্রই সাড়া দিয়েছেন। দরিদ্র বিধবাদের ভবিষ্যৎ দুর্দিনের সংস্থানে সোশ্যাল ইনসিওরেন্স এর প্রথম চিন্তার ফসল তাঁরই সৃষ্ট হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্নুয়িটি ফাণ্ড।

নিজের অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে নিখাত পাকা সোনা হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আপন বিবেকের কাছেই মানব প্রেমের পাঠ নিয়েছিলেন। তাই মানুষের ধর্ম বা Religion of Manই ছিল তাঁর আসল ধর্ম। তিনি ছিলেন শাশ্বত মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক। রামকৃষ্ণদেব তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ ই বলেছিলেন, "অন্তরে সোনা চাপা আছে···তবে খবর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কতকি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খবর নাই।"